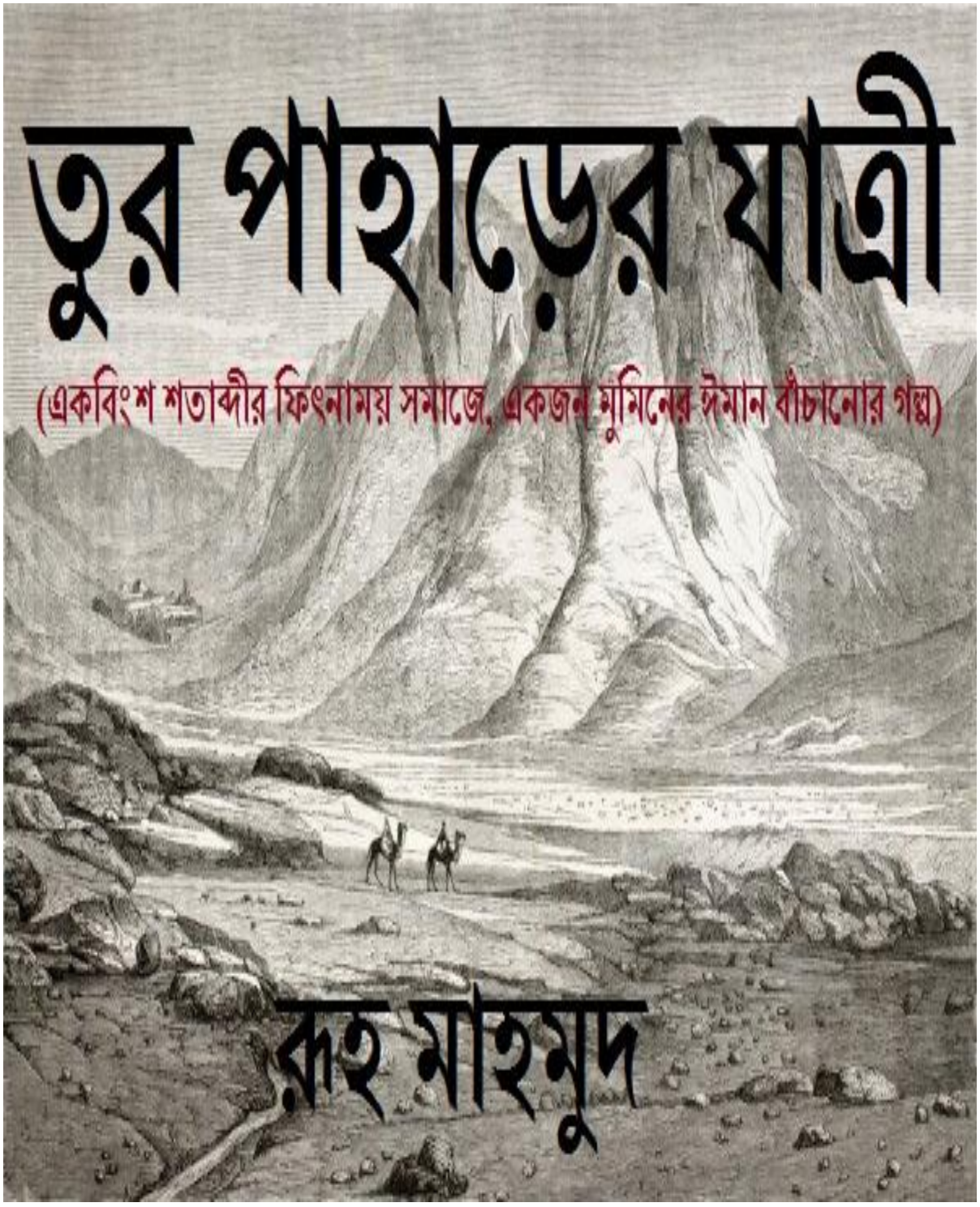
তুর পাহাড়ের যাত্রী
(একবিংশ শতাব্দীর ফিৎনাময় সমাজে, একজন মুমিনের ঈমান বাঁচানোর গল্প)
রূহ মাহমুদ

তুর পাহাড়ের যাত্রী

(একবিংশ শতাব্দীর ফিৎনাময় সমাজে, একজন মুমিনের ঈমান বাঁচানোর গল্প)

রূহ মাহমুদ

ভূমিকা:

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম। আম্মা বাদ। ফাআউযুবিল্লাহি মিনাস্সাই ত্বানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যার কোনো শরিক নেই। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তার সমকক্ষ কেউ নেই।

এই বইটা উপন্যাস টাইপের হবে। কিন্তু যথেষ্ট তথ্যবহুল হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানের এই ফেতনার দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করে একজন মুমিন কিভাবে তার ঈমান বাঁচিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, সে আলোচনাই উঠে আসবে এই কিতাবে। তার পুরো জীবনের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা সহ খুঁটিনাটি সবকিছুকে এমন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ, যেন বইটাকে বাস্তব মনে হয়। সাথে থাকবে আগামী (ভবিষ্যত) বিশ্বের একটি রূপরেখা। যেখানে থাকবে না কোনো পানি। থাকবেনা কোনো অক্সিজেন। থাকবেনা কোনো খাবার। থাকবেনা কোনো মানবতা। এমন এক ভয়ংকর দুনিয়ায়, একজন মুমিনের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার গল্প নিয়েই হাজির হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি কখনো আপনাকে হাসবে, কখনো ভীত করবে, আবার কখনো কাঁদাবে, কখনো বা আপনাকে ফেলে দিবে গভীর চিন্তার জগতে। আবার কখনো অন্তরের ভিতর থেকে শুকরিয়া আদায় করতে উৎসাহিত করবে। শিখাবে নতুন করে ভাবতে।

লেখকের কথা:

আপনারা যারা আমার সাথে দীর্ঘিদিন ধরে আছেন। অর্থাৎ ফেসবুকে আমার লিখাগুলো পড়েন এবং ইউটিউবে আমার মুজাকারা গুলো শুনেন। তারা ভালো করেই জানেন যে, আমি খুব সাধারণ ভাষায় লিখি এবং কথা বলি।

এতে দুটো লাভ হয়।

১) আমাকে ভাষার অলংকরণের পিছনে সময় নষ্ট করতে হয়না।

২) পাঠকের সাথে একেবারে মিশে যেতে পারি। মনের কথাগুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারি।

আমি মনে করি নিজে কঠিন ভাবে বুঝে, পাঠককে সহজ করে বুঝানোটাই উত্তম। কঠিন শব্দ ও ভাষার মারপ্যাচ না দেয়াটাই ভালো।

বই পড়া ও টুক টাক লিখালিখি করার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই ছিল, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই অভ্যাসটাই আজ আমাকে এখান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমার রেগুলার পাঠকরা জানেন যে, আমি এই পর্যন্ত ১০টি বই (পিডিএফ) বানিয়েছি। এর মধ্যে "এজ অফ ডার্ক ফিতনা" সম্পূর্ণ আমার লিখা। আর বাকি ৯টি আমার এবং অন্যদের লিখার সংমিশ্রনে বানানো সংকলিত গ্রন্থ।

সংকলিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে:

আর্মি অফ দাজ্জাল ১-৪ খন্ড।

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী ১-৪ খন্ড।

ইয়াজুজ মাজুজ বা গগ ম্যাগগ, বন্দি নাকি মুক্ত? মানুষ নাকি জন্তু?

যারা ওই ১০ টি বই পড়েছেন, তাদের জন্য এই (তুর পাহাড়ের যাত্রী) বইটি বুঝতে সুবিধা হবে। তাই অনুরোধ করবো, আগে ওই বইগুলো পড়ার জন্য। কারণ, এটাকে যেহেতু উপন্যাসের মতো করে সাজিয়েছি, তাই দলিল প্রমান বা জটিলতার মধ্যে যেতে চাচ্ছিনা। খুব সহজ সাবলীল করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে সাধারণ একজন পাঠকও মূল বিষয়বস্তুটি বুঝে নিতে পারে। আল্লাহ তৌফিক দান করুন।

আমি আমার প্রত্যেকটা কিতাবেই বলেছি, আমি প্রফেশনাল কোনো লেখক নোই। সাধারণ একজন চাকুরীজীবি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে একটু একটু করে লিখি। তাই আমি আমার মতো করেই লিখি। যেহেতু খুব ব্যস্ততার মধ্যে দ্রুত লিখতে হয়, তাই অনেক ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটিও হয়ে যায়। আর তাছাড়া ভুলের উর্দ্ধেতো কেউ নয়। সুতরাং, আমার সকল ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহব্বান করছি।

পাশাপাশি আমিও আল্লাহর কাছে শয়তানের ধোঁকা ও পথভ্রষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যেন আমাকে সঠিক পথে রাখেন এবং আপনাদেরকেও আমার দ্বারা সঠিক ও সত্য তথ্য জানানোর তৌফিক দান করেন।

-Rooh Maahmood- 21/6/21

সূচি

মাগরিবের আজানের পর:

পরিবর্তনের আহব্বান:

বিভ্রান্তির বেড়াজালে আনাস:

সঠিক পথের সন্ধান:

একটি ভুল সিদ্ধান্ত:

একটি হারাম সম্পর্কের আহব্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান:

পোস্ট গ্রাজুয়েশন ও রিজিকের অন্নেষণ:

দ্বীনের অর্ধেক পূরণ:

কালো জাদুর প্রভাব ও জিনের আছর:

কঠিন ও বাস্তব জীবনের মুখোমুখি:

প্রশান্তির ভাবনাগুলো:

ফেতনা থেকে বাঁচার চেষ্টাই যখন ফেতনার কারণ:

পুরোনো বাড়িতে প্রত্যাবর্তন:

অফিসের ফেতনা:

অফিস যখন গবেষণাগার:

পুনরায় গন্ডগোল:

দুনিয়াপ্রেমী বাবা বনাম দ্বীনদার ছেলে:

মাদ্রাসা নাকি স্কুল:

সাদা জুব্বার অন্তরালে:

আরো কিছু পারিবারিক ফেতনা:

ফেৎনাময় সমাজ:

অতীতের সুন্দর দিনগুলো:

২০২০ ও ২০২১ এর অদ্ভুত কিছু ফেতনা:

দাজ্জালি ফেতনায় ঈমান বাঁচাতে পারবো তো?

স্মার্ট পৃথিবী:

আলট্রা স্মার্ট সিটি:

প্রযুক্তি ও আধুনিক সংস্কৃতির নামে কালো জাদুর চর্চা:

বিপর্যস্ত দুনিয়া:

ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম: (হত্যা ও বিজয়)

তুর পাহাড়ের পথে:

মাগরিবের আজানের পর:

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। এমনিতেই প্রকৃতির সৌন্দর্যতায় ভরপুর একটি নাতিশীতোষ্ণ দেশ। তার উপরে বিভিন্ন জেলার আছে বিভিন্ন সৌন্দর্যতা। এমনি একটা সবুজে ভরা এক জেলায় মাগরিবের আজান চলছে।

শীতের সন্ধ্যা। আজানের পর শুনশান নীরবতা। সবাই নামাজে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়, ওই নীরবতাকে ভেঙে আল্লাহর ইচ্ছায় এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

এই সংবাদ পুরো গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। চারদিকে খুশির বাতাস বয়ে গেলো। যেহেতু শিশুটির নানা ওই এলাকার সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যাক্তি, তাই আলাদা কদর হতে লাগলো। সবার কোলে কোলে আর আদরে আদরে বড় হতে লাগলো। নাম রাখা হয়েছে, ‘‘মুহাম্মদ আনাস’’।

আনাসের বাবা ছিল চাকুরীজীবি। তাই আনাস ও তার মাকে ১ বছর পর ঢাকায় নিয়ে গেলো। অর্থাৎ ওই সময় আনাসের বয়স ১ বছর। এবার আনাস এখানেই বড় হতে লাগলো।

আনাসের নানার পরিবার ছিল, অত্যন্ত ধার্মিক পরিবার। তাই ওর মা খুব পরহেজগার ছিল। কিন্তু ওর বাবা অতটা ধার্মিক না হওয়ায় আনাস পরিপূর্ণ ধার্মিক হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবে নানার পরিবারের ধার্মিকতার প্রভাব ওর উপরে ছিল। আনাসের নানা চেয়েছিলো, আনাসকে মাদ্রাসায় ভর্তি করতে। কিন্তু আনাসের বাবা ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ফ্রিমেসনিক সিলেবাস সংশ্লিষ্ট স্কুলে পড়ার ফলে অন্য সকল মুসলিম সন্তানদের যা হয়, আনাসের জীবনেও তাই হলো।

অর্থাৎ ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত স্কুল ও কলেজে পড়াশুনার ফলে নানার পরিবারের প্রভাবটুকুও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো। এক পর্যায়ে কোনো প্রভাবই (দীনদারিত্বের) থাকলোনা। বরং সেকুলার সমাজের প্রভাবে আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলো। জীবনকে যেভাবে উপভোগ করা সম্ভব, সবকিছুই করলো। জীবনের স্বাদ নেয়ার জন্য, অন্য সবার মতো যা যা প্রয়োজন সব করেছে আনাস। সারাটা দিন গেম্স্, খেলাধুলা, গান, সিনেমা, নাটক, ব্যান্ড প্রাকটিস, ফ্যাশন শো, ঘুরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা দিয়েই কেটে যেত।

নিজের স্কুল ফ্রেন্ডের নিয়ে একটা ব্যান্ড দলও গড়ে তুলেছিল। অনেকগুলো পারফর্মও করেছে আনাসের ব্যান্ড দল। কলেজে উঠে ছাত্র রাজনীতি, সামাজিক সংগঠন, স্কাউট, বিএনসিসি ইত্যাদির সাথেও জড়িয়েছে আনাস।

দেখতে সুদর্শন হওয়ায় ধীরে ধীরে মিডিয়া জগতের সাথেও জড়িয়ে গেলো। কয়েকটি রাম্প (ফ্যাশন) শো করে ফেললো। আবার খেলাধুলাতেও আনাস ছিল চ্যাম্পিয়ন।

মোটকথা একটা আধুনিক ছেলের যা যা স্বপ্ন থাকে, সবকিছুই আনাসের জীবনে বাস্তবরূপে এসেছে।

তবে হা, পরহেজগার মায়ের সন্তান কিছু কিছু ব্যাপারে ঠিকই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আসলে আল্লাহ তাআলাই রেখেছেন, তার মায়ের দীনদারিত্ব ও কঠোর পর্দার কারণে।

আনাস এতো কিছুর সাথে জড়ালেও ছেলে হিসেবে খুব ভালো ছিল। শান্ত, ভদ্র, নম্র ও লাজুক স্বভাবের হওয়ায় কম বেশি সবাই ওকে আদর করতো। ভালোবাসতো। ওর সবচেয়ে বড় দুটি গুণ হচ্ছে, ও ছোটবেলা থেকেই সৎ এবং আমানতদার। নিজের সততা ও আমানতদারিতে খুব মজবুত অবস্থানে ছিল আনাস। তাই সবার কাছে বিশ্বস্ত

হয়ে উঠেছিল। কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতো না। কাউকে কষ্ট দিতো না। কমবেশি সবার উপকার করার চেষ্টা করতো। সমাজের অন্যায় অনাচার গুলো মেনে নিতে পারতো না। সবসময় ভাবতো কি করে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়?

কেন মানুষ রাস্তায় ময়লা ফেলে রাস্তাকে নোংরা করে রাখে? কেন একজন আরেকজনের জমি দখল করে রাখে? কেন চাঁদাবাজি করে? কেন চারদিকে এতো দুর্নীতি? এতো অবিচার? এতো অন্যায়?

চলার পথে, এসব শত শত কেনোর উত্তর খুঁজে ফিরত তরুণ আনাস। আনন্দ ফুর্তিতে ব্যস্ত থাকলেও, এই বিষয়গুলো আনাসকে সবসময় ভাবাতো।

নিজের এলাকায় এসব সমস্যা সমাধানের জন্য একটি তরুণ সংঘঠনও গড়ে তুলেছিল। কিছু ভালো ভালো উদ্যোগের দ্বারা সমাজে কিছু পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ স্থানীয় কিছু লোকজন এবং রাজনৈতিক কিছু সংঘঠন এটাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করছিলো। ফলে আর টিকেনি। সংগঠনটি বন্ধ হয়ে গেলেও, সকল সদস্যের ভিতরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা এবং নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকার মানসিকতা গড়ে দিতে পেরেছিলো আনাস।

এলাকার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আনাস একপর্যায়ে স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যায়। খুব দ্রুত উপর লেবেল পর্যন্ত চলে যায়। এখন আনাস নেতাদের সাথেই বেশি সময় দেয়। সব মিলিয়ে ভালোই চলছে ওভার স্মার্ট আনাসের জীবন। সবকিছুতেই, ও অন্যদের চেয়ে এডভান্স।

আনাসদের বাসার একটু সামনেই বিশাল এক মাঠ ছিল। একদিন আনাস তার কিছু বন্ধুর সাথে বসে সেখানে আড্ডা দিচ্ছিলো। ওদের আড্ডা চলাকালীন সময়ে একটি মানুষ যে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এটা ওরা কেউই খেয়াল করেনি।

এবার পুরো কাহিনীটা আমরা আনাসের নিজের মুখেই শুনবো, ইনশাআল্লাহ।

পরিবর্তনের আহব্বান:

পাঠক, এখন আপনাদেরকে আনাসের পরিবর্তনের সময়টিতে নিয়ে যাবো। ঘটনা সেখান থেকেই শুরু হবে।

(আনাসের মুখে শুনুন):

সুন্দর এক বিকালে, বড় একটি মাঠের একপাশে কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে, আরেকপাশে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ, শুনি আসসালামু আলাইকুম। সবাই সেদিকে তাকালাম। দেখি বাবরি চুল ওয়ালা, সাদা পাগড়ি ও সাদা জুব্বা পরিহিত এক ভাই আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম, মানে আমাদের আড্ডা থামিয়ে দিলাম।

ভাইটি বললো: "আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পারি"?

আমরা সবাই বললাম: "অবশ্যই"।

তিনি প্রথমেই আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, মহত্ব ও দয়া সম্পর্কে কিছু হৃদয় জুড়ানো কথা শুনানো শুরু করলেন। অন্যরা কিভাবে শুনছে, জানিনা। তবে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছি। খুবই ভালো লাগছে কথাগুলো। এমন করে এর আগে কখনোই শুনিনি। ভাইয়ের প্রত্যেকটি কথা আমার চিন্তার জগৎকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে শুনছি।

কথা শেষ করার পর, ভাই আমাদেরকে মসজিদে যাওয়ার আহব্বান করলেন। আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম। ভাইয়ের সাথেই মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলাম। ওযু করে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আসরের নামাজটাও পড়ে নিলাম। সেখানেও এক ভাই দ্বীনি আলোচনা করছিলেন। নামাজের পর তার কাছে গিয়ে বসলাম। উনার কথা গুলোও মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম।

যেহেতু মসজিদের ভিতরে এমনিতেই রহমতের পরিবেশ, তার সাথে দ্বীনি কথা গুলো আরো ভালো লাগছে। অল্প সময়ের জন্য আসলেও পুরো কথা শুনতে শুনতে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গেলো। তাই মাগরিবের নামাজটাও জামাতের সাথে পড়ে নিলাম। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সাদা পাগড়ি ওয়ালা ওই ভাই বললেন, "এশার নামাজের পর তালিম হয়, বসার দাওয়াত রইলো"। আমি আচ্ছা বলে বের হয়ে আসলাম। বাসায় গিয়ে কথাগুলো ভাবতে লাগলাম এবং এশার নামাজে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। কথা গুলো ভাবছি, এমন সময় কানে এশার আজানের আওয়াজ ভেসে আসলো। ওযু করতে উঠে পড়লাম।

ওযু করে, একটা পাঞ্জাবি পড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলাম। মসজিদে গিয়ে দেখি খুব বেশি মুসুল্লি নেই। আমি একপাশে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। ইকামত শুরু হলে উঠে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালাম। পুরো নামাজ শেষ করে, যেখানে ছিলাম সেখানেই বসে রইলাম।

সবাই যার যার মতো নামাজ পড়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাইকে দেখলাম একপাশে বসে আছে। আমিও উঠে গিয়ে সেখানে বসলাম। কিছুক্ষন পর এক ভাই তালিম করা শুরু করলেন। আমি চুপচাপ শুনছি। প্রতিটি হাদিস অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছি। খুব ভালো লাগছে। অন্যরকম এক প্রশান্তি অনুভব করছি। মাঝে মাঝে সবাই সুবাহানআল্লাহ বলছে, আমিও বলছি।

একপর্যায়ে তালিম শেষ হয়ে গেলো। কিছু ভাই উঠে চলে গেলো। বাকিরা বসে রইলো। আমিও তাদের সাথে বসে রইলাম। উঠতে ইচ্ছা করছিলো না। বসে বসে তাদের কথা শুনছি। একসময় তাদের কথাও শেষ হয়ে গেলো। তারাও সবাই উঠে গেলো। পাগড়ীওয়ালা ভাই আমাকে ফজরের নামাজে আসতে বললো। আমিও আসবো বলে কথা দিলাম। এবং বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় ঢুকে দেখি, আম্মু খানা তৈরী করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। খেতে বসে পড়লাম। খাওয়াদাওয়া শেষে কিছুক্ষন আম্মুর সাথে গল্প করে নিজের বিছানায় চলে আসলাম। মশারি করে শুয়ে পড়লাম।

(আনাসের ছোট্ট একটা রুম। একটা খাট, কম্পিউটারের টেবিল, পড়ার টেবিল, আর একটা ওয়ারড্রোব। পুরো রুমে স্প্রে রং দিয়ে ওয়েস্টার্ন স্টাইলে বিভিন্ন ডিজাইন করে রেখেছে। রুমের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর ডিভিডি ডিস্ক (গান ও মুভির)। একপাশে ড্রামস সেট। যেহেতু আনাস তার ব্যান্ডের ড্রামার ছিল, তাই মাঝে মাঝে ড্রামস প্রাকটিস করার জন্য নিজেই একটা সেট কিনে ফেলেছে। পড়ার টেবিলে বিভিন্ন লেখকের অনেকগুলো উপন্যাসও আছে। আর বিভিন্ন রকম ফ্যাশনেবল জুতা, প্যান্ট, শার্টের তো অভাবই নেই। সহজ কোথায়, আধুনিক ও স্টাইলিশ জীবন যাপন করার জন্য যা যা দরকার, মোটামুটি সবকিছুই আছে আনাসের ছোট্ট রুমটিতে।)

ফজরের নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার জন্য আনাস অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলো। ভোর ৪ টায় আনাসের মোবাইলে অ্যালার্ম বাজা শুরু করেছে। ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে ওয়াশরুমে চলে গেলো আনাস। একবারে ওযু করে বের হয়ে, পাঞ্জাবি পড়ে মসজিদের জন্য ঘর থেকে বের হলো। আগের দিন রাতে ওর আম্মুকে বলে রেখেছিলো, আজ ও ফজরের নামাজ মসজিদে পড়বে।

মসজিদে গিয়ে কবে ফজরের নামাজ পড়েছি মনে নেই। বা আদৌ পড়েছি কিনা তাও বলতে পারবোনা। তাই ঘর থেকে বের হতে কিছুটা সংকোচ লাগছিলো। তবুও সাহস করে বের হলাম। মসজিদটা বাসা থেকে কিছুটা দূরে। মূল রাস্তায় আসার পর আরো কিছু মুসুল্লীকে দেখে ভয় কেটে গেলো। নিরিবিলি রাস্তায় মৃদু ও হালকা শীতল বাতাসে হাটতে খুব ভালো লাগছে। শরীর ও মন দুটোই জুড়িয়ে যাচ্ছে।

মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়লাম। এরপর যথারীতি জামাতের সাথে ফরজ দুই রাকাত পড়ে ওখানেই বসে আছি। সবাই যার যার মতো চলে যাচ্ছে। কিছু ভাইকে দেখলাম মিম্বরের কাছে গোল হয়ে বসেছে। পাগড়ীওয়ালা ভাইটি আমাকে সেখানে বসার জন্য ডাকলেন। আমিও গিয়ে বসে পড়লাম। তারা নিজেদের কিছু দ্বীনি কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এক ভাই একটা খাতা বের করলো। রেজিস্টার টাইপের। কি যেন লিখছেন। এভাবে আলোচনা ও লিখালিখি শেষ করে তারা বের হয়ে গেলো। আমিও উঠে আসলাম। বাসায় এসে কিছু নাস্তা খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। দুপুরের কিছু আগে উঠে নিজের ভার্সিটির কিছু পড়াশুনায় বসলাম। জোহরের আজান হতেই উঠে গোছল করে নামাজের প্রস্তুতি নিলাম। কারণ ওই ভাইটি আমাকে জোহরেও মসজিদে আসতে বলেছিলেন। তার কথায় কেমন যেন এক আকর্ষণ। তিনি প্রত্যেকবার আমাকে মসজিদে আসতে বলছেন, আর আমিও তাই করছি। এভাবেই আসর, মাগরিব, এশা সব নামাজই জামাতের সাথে পড়ে ফেললাম, আলহামদুলিল্লাহ।

এশার পর তালিমে বসছি। পাগড়ীওয়ালা ভাই আমার হাতে হাদিসের কিতাব দিয়ে আমাকে তালিম করতে বললেন। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কারণ জোরে জোরে রিডিং পড়তে আমার ভালো লাগে। উচ্চারণ ভালো থাকায় স্কুল কলেজেও প্রায়ই সার ম্যাডাম আমাকে দিয়ে রিডিং পড়াতেন। সেই সুবাদে এ ব্যাপারে আমি দক্ষ ছিলাম।

কিতাবটিতে মার্ক করা ছিল। আজ যেখান থেকে পড়ার কথা, সেখান থেকেই পড়া শুরু করলাম। কিতাবটি বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা ছিল। প্রায় ২০ / ৩০ মিনিট ধরে তালিম করলাম। এই তালিমের মজলিসে আমার খুব ভালো একজন বন্ধুও ছিল। ঐযে প্রথম দিন আমরা যেকয়জন মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, তাদের মধ্যে থেকে একজন। তালিমের পর আমি আর আমার ওই বন্ধু "মুয়াজ" মসজিদের বাইরে বের

হয়ে একপাশে গিয়ে গল্প করছি। এখন আমাদের গল্পের ধরণে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। একটু আগে যেসব হাদিস পড়লাম তা থেকেও কিছু আলোচনা করলাম। আমাদের গল্প শেষে যে যার মতো নিজ নিজ বাসায় চলে আসলাম। ধীরে ধীরে আমরা দুই বন্ধু মসজিদের প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম। এখন আর বিকালে মাঠে গিয়ে আড্ডা দিতে বা খেলতে ভালো লাগেনা। বরং সেই সময় মসজিদে বসে কিতাব পড়তে বা দ্বীনি আলোচনা করতেই বেশি ভালো লাগে। প্রত্যেক নামাজের পড়ে আমরা মসজিদে বসে দ্বীনি আলোচনা করি।

এভাবেই চলতে লাগলো।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনি আমার বড় ফুপু মারা গেছেন। আমরা সবাই সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি ফুপুর গোছল ও কাফন পড়ানো শেষ। এখন দাফন করতে নেয়া হবে। দাফনের জন্য আমিও সাথে যাচ্ছি।

কবর আগেই খোঁড়া হয়েছে। আমরা গিয়ে সরাসরি লাশকে কবরে নামানোর প্রস্তুতি নিলাম। আমিও কবরে নামলাম। কারণ এই ফুপু আমাকে খুব আদর করতো। তাই শেষ বিদায়টা নিজ হাতে দিতে চাইলাম। আমি এই প্রথম কবরে নামলাম। কিছুটা ভয় লাগছে। ফুপুর লাশটা কবরে নামানোর সময় আমার মনে হচ্ছিলো ফুপু আমার সাথে কথা বলছে। ফুপুকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সবাই উপরে উঠে মাটি ফেলছে। আমিও মাটি ফেলছি আর ভাবছি: "হায় ফুপুর এতো টাকা, এতো সম্মান, এতো সম্পদ, কোথায় গেলো? কিছুই তো তিনি সাথে নিতে পারলেন না"। আমার ফুপু ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সম্পদ ও সম্মান, কোনোটারই অভাব ছিল না তার। কিন্তু আজ উনাকে একেবারেই খালি হাতে যেতে হচ্ছে। একেবারেই খালি হাতে।

বিষয়টা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুললো। আমাকেও যেন মৃত্যু ভয় পেয়ে বসলো। দুনিয়ার এই জীবনকে কেমন যেন অহেতুক আর মূল্যহীন মনে হচ্ছে। এগুলো ভাবতে ভাবতে ফুপুর কবরকে পিছনে ফেলে সামনে আগাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো ফুপু যেন আমাকে ডেকে বলছে, তোরা যাসনে। আমাকে এখানে একা রেখে যাসনে। হৃদয়টা তীব্র এক ব্যাথায় ভরে উঠলো। ভিতরে ভিন্ন রকম এক ব্যাথা অনুভব করছি। আসলে এমন পরিস্থিতিতে আমি একদমই নতুন। তাই সবকিছুই অন্য রকম লাগছে। এতদিনের চেনা পৃথিবীকেও খুব অচেনা লাগছে। নিজের মৃত্যুর ভাবনাটাও ঘিরে ধরায় নিজেকে বড্ডো একা লাগছে।

বাসায় ফিরে এসেও মনটা খারাপ হয়ে আছে (থাকাটাই স্বাভাবিক)। কিছুই ভালো লাগেনা। নিজের পড়াশুনা, মিউজিক প্রাকটিস, মুভি, আড্ডা কিছুই ভালো লাগেনা। সবকিছুই অর্থহীন মনে হচ্ছে। কারো সাথে কথা বলতেও ভালো লাগেনা। চুপ চাপ থাকতেই ভালো লাগে। শুধু মসজিদে গেলে কিছুটা ভালো লাগে। তালিম আর তেলোয়াত শুনলে মনে প্রশান্তি পাচ্ছি। অন্য কোনো কিছুতেই মন বসছেনা। তাই মসজিদেই আরো বেশি সময় দেয়া শুরু করলাম। এখন ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ি। এবং নামাজের পর দ্বীনি ভাইদের সাথে মসজিদে সময় দেই। এই কিছুদিন ধরে যেই হতাশায় ভুগছিলাম, জীবনকে অর্থহীন মনে হচ্ছিলো, এখন সেই হতাশা কেটে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছি। প্রকৃত লক্ষকে চিনতে পেরেছি। অনুভব করতে পারছি যে এতদিন যা করেছি, তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। শয়তানের পথ। এখন আমাকে আমার রবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যে গতিতে আমি ভুল পথে এগিয়েছি, তার চেয়েও বেশি গতিতে আমাকে আখেরাতে দিকে দৌড়াতে হবে।

নিজের অতীতের সকল ভুল ও পাপের জন্য আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি শুরু করলাম। প্রত্যেক নামাজের পরেই দোআ করি। তাতেও মন ভরেনা। তাই তাহাজ্জুদের নামাজ পরে বিশেষ ভাবে তওবা করতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিদিনই তাহাজ্জুদে উঠে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করি। আর ক্ষমা চাই। ধীরে ধীরে অন্তরে প্রশান্তি আসতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আল্লাহ আমার তওবা কবুল করেছেন। নিজেকে এখন পবিত্র মনে হচ্ছে। হালকা লাগছে। খুব শান্তি পাচ্ছি।

আল্লাহ আমাকে খুব দ্রুতই কবুল করে নিলেন। কারণ খুব কম সময়ে আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলো। জীবনটা একদম উল্টে গেলো। এই কিছুদিন আগেও যেসব জিনিস (ব্যান্ড, মুভি, ফ্যাশন, গেম্স্, আড্ডা, ইত্যাদি) ছাড়া আমি চলতেই পারতাম না, সেসবকেই আজ প্রচন্ড ঘৃণা করি। শুধু যে ঘৃণা করি তা নয়, বরং এসবের কথা ভেবে অনুতপ্ত হই, অনুশোচনায় ভুগি। আর কান্নায় ভেঙে পড়ি। ভাবি, জীবনের কি বিশাল এক অংশ ভুল পথে নষ্ট করে ফেলেছি। এবং প্রতিবারেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই যে, এসব কিছু ছেড়ে দিবো। সবকিছু আমার থেকে দূরে সরিয়ে ফেলবো। কোনো স্মৃতি রাখবোনা। যেই কথা সেই কাজ। প্রথমেই আমার পুরো ড্রামস সেট (যেটা আমার খুব প্রিয় ছিল) আমাদের বাসার পাশে এক ডোবায় ফেলে দিলাম। সাথে অন্যান্য যেসব মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল (শত শত ডিভিডি ডিস্ক, ড্রামস স্টিক ইত্যাদি) সবকিছু ফেলে দিলাম।

আম্মু তো আমার এসব কাজ দেখে অবাক হয়ে গেছে। ভাবছে আমি মনে হয় পাগল হয়ে গেছি। যেই জিনিস নিয়ে আব্বু আম্মুর সাথে কত তর্ক করেছি, সেই জিনিস কিনা আমি ফেলে দিচ্ছি?? আমি পরে আম্মুকে সব বুঝিয়ে বললাম। তখন আম্মু নিশ্চিন্ত হলো। আবার খুশিও হলো। কারণ আম্মু এসব পছন্দ করতোনা। সবকিছু ফেলে দেয়ার পর ঘরটাকে খুব হালকা আর পবিত্র মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে গান শুনা ও মুভি দেখাও

একেবারে ছেড়ে দিলাম। এরপর যেসব বন্ধুদের দ্বীনের বুঝ নেই, তাদের সাথে আড্ডা দেয়াও বন্ধ করে দিলাম। আমার ঠিকানা এখন, ঘর আর মসজিদ। সঙ্গী হচ্ছে দ্বীনি ভাইয়েরা। আল্লাহ তায়ালা আমাকে খুব দ্রুত পরিবর্তন করে দিলেন। আমার মানসিকতা একদম দ্বীনমুখী করে দিলেন। আমার স্বপ্ন এখন একটাই: আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জান্নাত।

কিন্তু এ পথে কিভাবে আগাবো? তাতো আমি জানি না। সেটা জানেন আলেমরা। সুতরাং, এবার আমার পছন্দের তালিকায় চলে আসলো আলেমদের মজলিস বা বিভিন্ন ইলমী মজমা। যখনই যেখানে কোনো দ্বীনি মাহফিলের খবর পাই সেখানেই ছুটে যাই। আশে পাশে যত মাদ্রাসা ও মসজিদ আছে সব জায়গায় আমি গিয়ে বসে থাকি। ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জেন সাহেব, খতিব সাহেব, মুফতি সাহেব, মুহাদ্দিস সাহেব সকলের সাথে খাতির করে ফেললাম। খুব দ্রুত তাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠলো। আলহামদুলিল্লাহ।

উনাদের সোহবতে থাকতে থাকতে আমার পোশাক আশাক ও চালচলনেও পরিবর্তন চলে আসলো। পায়জামা পাঞ্জাবি আর টুপি ছাড়া অন্য কিছু পড়তে ভালো লাগেনা। তাই প্রথমে আমার ফ্যাশনেবল টিশার্টগুলোর মধ্যে থেকে কিছু শার্ট মানুষকে দিয়ে দিলাম। আর কিছু শার্ট ফেলে দিলাম। পরবর্তীতে আমার সকল প্যান্ট শার্টের সাথেও একই আচরণ করেছি। মোটকথা অতীতের সকল গুনাহের স্মৃতিগুলো মুছে ফেলে নিজেকে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহর ইচ্ছায় একপর্যায়ে সফল হলাম। অর্থাৎ সকল পাপের আসবাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে সক্ষম হলাম, আলহামদুলিল্লাহ। এখন নিজেকে মুক্ত লাগছে। গুনাহের পরিবেশ ও আসবাব থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। এবং নেকীর পরিবেশ ও আসবাবের কাছাকাছি করে দিয়েছেন।

এখন আমার ট্র্যাক (চলার পথ) পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জজবা (আগ্রহ) আগের মতোই আছে। আগে আমি বিভিন্ন ফ্যাশন শো বা ব্যান্ড কনসার্টে ছুটে যেতাম। আর এখন মাদ্রাসা বা মাহফিলে ছুটে যাই।

আগে সারাদিন ডেড মেটাল গান আর ইংরেজি মুভি নিয়ে পড়ে থাকতাম। আর এখন কুরআন তেলোয়াত আর নাশিদ নিয়ে পড়ে থাকি।

আগে ফালতু উপন্যাস পড়তাম। এখন হাদিস, তাফসীর ও বিভিন্ন দ্বীনি কিতাব পড়ি।

আগে প্যান্ট, শার্ট, ক্যাপ পড়তাম। এখন পায়জামা, পাঞ্জাবি ও টুপি পড়ি।

আগে বডি স্প্রে ব্যবহার করতাম এখন আতর।

আগে ব্রাশ আর পেস্ট। এখন মেসওয়াক।

এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা জিনিসেই দ্বীনের ছোয়া চলে আসলো আলহামদুলিল্লাহ।

আর এই নতুন জীবন নিয়ে আমি এখন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। খুব অল্প সময়ের ভিতর আমার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলো।

এরই মধ্যে এক ফ্রেন্ডের কাছে খবর পেলাম ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার ডেট পড়েছে, সামনের মাসে। আমি তো ভার্সিটির পড়াশুনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুটা চিন্তায় পরে গেলাম। কারণ হাতে সময় খুব কম। ফ্রেন্ডটির কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে সেটাই পড়া শুরু করে দিলাম। বাকি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন চলে আসলো। নীল রঙের একটা পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামার সাথে সাদা টুপি পরে রওয়ানা দিলাম। মুখের দাড়িও যথেষ্ট বড় হয়েছে। মাথা নিচু করে সোজা হলে ঢুকে পড়লাম। বিশাল অডিটোরিয়ামের একদম পিছনে গিয়ে বসেছি। কেউ আমাকে

চিনতে পেরেছে বলে মনে হলোনা। এটা বরং আমার জন্য ভালোই হলো। কারণ আমিও কারো সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না।

৪০০ / ৫০০ স্টুডেন্ট একসাথে বসেছে। যে যার মতো পরীক্ষা নিয়েই ব্যাস্ত। কারো দিকে কারো তাকানোর সময় নেই। আমিও আমার মতো লিখে যাচ্ছি। এভাবে ৩ ঘন্টা শেষ হয়ে গেলো। আল্লাহর ইচ্ছায় ভালোই লিখলাম। খাতা জমা দিয়ে হল থেকে বের হয়ে প্রধান গেটের দিকে আগাচ্ছি। হঠাৎ কেউ একজন আমাকে ডাক দিলো। তাকিয়ে দেখি ভার্সিটিতে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি আমাকে ঠিকই চিনে ফেলেছে। ওর নামও আনাস। সবসময় একসাথেই আসা-যাওয়া করি। ওর সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্টের আরো কিছু স্টুডেন্ট ছিল। ওরাও আমার ভালো ফ্রেন্ড। ওখানে কিছু মেয়েও ছিল। সবাই আমাকে দেখে মহা আশ্চর্য হয়ে গেছে। কেউ কেউ তো বিশ্বাসই করতে চাচ্ছেনা যে এটা আমি। ওরা আরো অনেক বেশি অবাক হয়ে গেলো, যখন দেখলো আমি কোনো মেয়ের সাথে কথা তো দূরের কথা তাকাচ্ছিও না। অথচ কিছুদিন আগেও, ক্যাম্পাসে আমরা দুষ্টামি ফাজলামি করে সময় পার করতাম।

যেহেতু ওখানে মেয়েরা ছিল তাই কোনোরকম কুশলাদি বিনিময় করে দ্রুত সেখান থেকে চলে আসলাম। বুঝতে পারছিলাম, সবাই একেবারে থ হয়ে গেছে, আমার এই আশ্চর্য ও হঠাৎ পরিবর্তন দেখে।

বাসায় আসার পর ফ্রেন্ডরা ফোন দেয়া শুরু করলো। সবাইকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। আর মেয়ে ফ্রেন্ডদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিলাম, তোদের সাথে আমি আর কখনোই দেখা করতে বা কথা বলতে পারবোনা। তোরাও আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করিস না। এরপর আর মেয়েরা আমার কাছে আসে না। আমিও ওরা থাকলে সেখানে যাই না। দুই একটা ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে পরীক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা

করেই দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এভাবে বাকি ৫ টা পরীক্ষা শেষ করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় পরীক্ষা গুলো ভালোই হলো।

এখন আমি আবার নিজের দ্বীন চর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। অন্য কারো সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। সারাদিন মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেমদের সোহবত আর কিতাব অধ্যয়ণ নিয়ে কাটে আমার। বাসায় পুরোনো কিছু ইসলামী বই ছিল, আপাতত সেগুলোই পড়ছি। আগে থেকেই তো আমার পড়ার অভ্যাস ছিল এখন সেটা ইসলামী কিতাবের দিকে ডাইভার্ট হয়ে গেলো।

ঘরে যা ছিল সব পরে ফেলেছি। এবার মাদ্রাসা ও মসজিদের লাইব্রেরিতে যা আছে তা পড়া শুরু করেছি। কারো কাছে কোনো বই পেলে ধার নিয়ে এসে বাসায় পড়ি। কিন্তু এভাবে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। তাই নিজেই অল্প কিছু বই কিনে ফেলি। সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মারেফুল কোরানটা বাসায় ছিল, সেটাও পড়া শুরু করি। এভাবেই আমার কিতাবের জগতে পা রাখা।

বিভ্রান্তির বেড়াজালে আনাস:

এভাবেই কাটছে আমার দিন। প্রতিদিন মসজিদে নামাজের পর, একপাশে গিয়ে কিতাব পড়ি। এতে অন্যান্য কিছু ভাইদের সাথে আমার পরিচয় হয়। তারা আমার কিতাব পড়ার আগ্রহ দেখে, কিছু বই দেয়। সেসব বই পড়ে আরো নতুন ও ভিন্নধর্মী কিছু জানতে পারি। তাদের সাথে কিছুদিন সময় দেই। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, তারা বিশেষ একটি সংগঠনের সদস্য। তাই তাদের সাথে আর সময় দেয়া হয়নি।

কিছুদিন পর দেখি মসজিদে অন্য রকম আরেকটি দল। তাদের এবাদতের ধরণ আবার আরেক রকম। তাদের সাথেও কিছুদিন সময় দিলাম। তাতেও মন ভরেনা।

তাই মসজিদের একজন পুরোনো ও রেগুলার বয়স্ক মুসুল্লীর সাথে এসব দল নিয়ে কথা বললাম। তিনি এই দলগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দিলেন, এবং নিজের তরিকার দিকে আহব্বান করলেন। আমি তার পদ্ধতিতে কিছুদিন আগানোর চেষ্টা করে বুঝতে পারলাম, যিনি আবার আরেক ধরণের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এই পদ্ধতিটাও আমার ভালো লাগলোনা।

আমি আমার মতো কিতাব পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

কিছুদিন পর অন্য কিছু ভাইর সাথে পরিচয় হলো। তারা খুব সুন্দর করে আমল করে। আমি তাদের আমল দেখে মুগ্ধ হলাম। অন্যদের আমলের সাথে তাদের আমলের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তারা আমাকে তাদের সাথে সময় দেয়ার জন্য আহব্বান করলো। আমিও তাদের ব্যাপারে আগ্রহী হলাম। কিন্তু কিছুদিন সময় দেয়ার পর বুঝলাম, তারাও একটি ফেরকা।

এই বিষয়গুলো আমার ভালো লাগছিলোনা। কারণ আমি দ্বীনের পথে নতুন। আমি জানি ইসলাম এক। মুসলিমরাও এক। কিন্তু এখন দেখছি বিভেদ আর বিভেদ। একদল দল আরেকদলের বিরুদ্ধে কথা বলে, নিজের দলের দিকে লোক ভিড়ানোর চেষ্টা করে। আমি খুব হতাশ হয়ে গেলাম।

এমনতো হওয়ার কথা নয়।

আমি খুব পেরেশান হয়ে গেলাম। কেমন যেন অস্থির লাগছে। অন্তর কি যেন একটা খুঁজে ফিরছে। আশেপাশের কোনো ইসলামী দলকে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছেনা। সবাইকেই নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত মনে হচ্ছে। তাহলে আমি কাদের সাথে সময় দিবো? একাই থাকবো? কি করবো কিছুই বুঝছি না।

ভাবলাম এসব বিষয় নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করবো। এবার এগুলো নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম। অর্থাৎ ইসলামের এই দল ও উপদল সম্পর্কে জানার জন্য নিজে পড়াশুনাও করছি আবার আলেমদের শরণাপন্নও হলাম। মোটামুটি কিছুদিন চেষ্টা করার পর বুঝলাম, অবস্থা ভালো নয়। মুসলিমদের মধ্যে হাজারো দল সৃষ্টি হয়ে গেছে। যে যার যার মতো করে ইসলামকে বুঝে নিয়েছে। এবং সেভাবেই ইসলাম পালন করছে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা বুঝতে পারলাম, সবাই নিজেদের দল ও মতকে সঠিক মনে করে এবং অন্য সকল দল ও মতকে ভ্রান্ত মনে করে। তাই দারুন এক বিভেদ সৃষ্টি হয়ে আছে সবার ভিতরে।

খুব দুশ্চিন্তায় পরে গেলাম।

হঠাৎ মনে পড়লো, আরেহ আমার তো সালাতুল হাজত আর তাহাজ্জুদ নামাজ আছে।

ব্যাস, রেগুলার সালাতুল হাজত আর তাহাজ্জুদ পরে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করি সঠিক পথের জন্য। অর্থাৎ সঠিক জামাতকে যেন আমি চিনতে পারি, আল্লাহ যেন

আমাকে সেই তৌফিক দান করেন। প্রতিদিন আমার এই আমল চলতে থাকলো। প্রতি নামাজের পরেও মুনাজাতে আমার এই দোআ থাকে। যেহেতু বিভিন্ন মাদ্রাসা, মাহফিল ও আলেমদের খাস মজলিসে আমার খুব আসা যাওয়া ছিল, তাই আমি কিছু হক্কানী আলেম ও লেখকের সন্ধান পাই। তাদের সাথে খাতির করার চেষ্টা করি এবং তাদের লিখা বইগুলো কিনে ফেলি। উনাদের সোহবতে থাকায় এবং উনাদের বই পড়ার ফলে অনেক বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ।

এবার এসব কিতাব থেকে আরো অনেকগুলো কিতাবের কথা জানতে পারি। সবগুলো একটা খাতায় নোট করে রাখি। এবং একটা একটা করে কিনতে থাকি। এভাবে অনেক গুলো কিতাব কিনে ফেলি। প্রতিদিন দুই তিনটা কিতাব পড়ে শেষ করে ফেলি। ফলে অনেক ধোঁয়াশা দূর হয়ে যায়। অনেক কিছু স্পষ্ট হতে থাকে। কোনো কিছু যদি নিজে না বুঝি, তাহলে আলেমদের কাছে গিয়ে বুঝে নেই। এতে আমার এলম আরো ধারালো, প্রশস্থ ও গভীর হতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ।

এরই মধ্যে একদিন আমার এক খালার বাসায় বেড়াতে গেলাম।

সঠিক পথের সন্ধান:

আমার এই খালা আমাকে খাওয়াতে খুব পছন্দ করে। উনাদের বাসা, আমাদের বাসা থেকে ৪০/ ৫০ কিমি দূরে। তাই মাঝে মাঝেই উনার বাসায় যাই। ইলিশ, হাঁস, চিংড়ি আর খাসি রান্না করলেই খালা আমাকে দাওয়াত দেয়। নিজে বসে আমাকে খাওয়ায়। আবার আমাদের বাসার জন্যেও দিয়ে দেয়। তো খালার বাসায় গিয়ে কিছু ইসলামী কিতাব দেখি। সেগুলো থেকে কিছু কিতাব আমি পড়ার জন্য খালার কাছ থেকে চেয়ে নেই। বাসায় এসে সবগুলো কিতাব খুলে দেখি। এর মধ্যে একটা কিতাবের নাম ছিল, "ইমাম মাহদী"। কিতাবের সূচিপত্র দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তখনি ওই কিতাবটা পড়তে বসে গেলাম। এক বসায় পড়ে শেষ করে ফেললাম।

কিতাবটির সূচিপত্র দেখে যতটা অবাক হয়েছি, তার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছি পুরো কিতাবটা পড়ে। মনে হচ্ছে আমি যেই জিনিসের সন্ধান করছি সেই জিনিস বোধহয় পেয়ে গেছি। কিতাবটা বার বার পড়তে ইচ্ছা করছে। এই কিতাবের প্রথম দিকেই হুজায়ফা (রা) এর একটা স্বভাবের কথা বর্ণনা করা ছিল। তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে বেশিরভাগ সময় ফেতনার কথা জিজ্ঞাসা করতেন, যেন তিনি ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। আমি খেয়াল করলাম আমার ভিতরেও এই স্বভাব বিদ্যমান। আর এই কিতাব পড়ার পর সেটা আরো গভীর হলো। অর্থাৎ এখন ফেতনা সম্পর্কে জানার তীব্র আগ্রহ তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে শেষ জমানা সম্পর্কে।

আমার মানসিকতা এমন হলো যে, ঈমানের উপর টিকে থাকতে হলে আগে কুফরকে চিনতে হবে। তাহলে কুফর থেকে বেঁচে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তাই এবার সকল প্রকার কুফর, ফেতনা, বিদআত, ষড়যন্ত্র গুলো চিনার ও বুঝার চেষ্টায় লেগে গেলাম। আরো কিতাব কিনলাম। শেষ জমানা সম্পর্কে যত কিতাব চোখে পড়ে, কিনে ফেলি। এর মধ্যে একদিন আরেক খালার বাসায় যাই। সেখানে অসংখ তাফসীর ও

হাদিসের কিতাব আছে। এতদিন এগুলো দেখতাম, কিন্তু কোনো গুরুত্ব ছিলোনা। আর এখন আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস এগুলো। খালার কাছে সবগুলো কিতাব চাইলাম। প্রথমে দিতে না চাইলেও, পড়ে তিনি রাজি হয়ে যান। বেশিরভাগ কিতাব দিয়ে দেন।

আমি তো মহা খুশি। অনেক বেশি খুশি।

যা দিলেন, সবগুলো নিজের বাসায় নিয়ে এলাম। কিতাবের সংখ্যা বেশি হওয়ায় একটা বুক সেলফ কিনে ফেললাম। কিতাবের নেশা পেয়ে বসেছে আমাকে। আগে কাপড় চোপড় ও ব্যান্ডের পিছনে যা খরচ করতাম তা এখন কিতাবের পিছনে করি। যেখানে যত কিতাব পাই কিনে ফেলি। কিন্তু হা, কিতাব কিনার ক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিসকে প্রাধান্য দিয়েছি।

১) হক্কানী আলেমদের কিতাবে রেফার করা কিতাব।

২) কিতাব কিনার সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে নেই।

অর্থাৎ আল্লাহকে বলি: "হে আল্লাহ, এই কিতাব গুলো যদি আমার জন্য উত্তম হয়, তাহলে এগুলো আমাকে কিনার তৌফিক দান করুন। আর যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে এসব থেকে আমাকে হেফাজত করুন"।

শুধু যে কিনার সময়েই দোআ করতাম তাই নয়। কোনো কিতাব পড়ার সময়ও একই দোআ করতাম। বলতাম: "হে আল্লাহ, এই কিতাব গুলো অধ্যয়ণ করা যদি আমার জন্য উত্তম হয়, তাহলে এগুলো আমাকে পড়ার ও বুঝার তৌফিক দান করুন। আর যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে এসব থেকে আমাকে হেফাজত করুন"।

আল্লাহ আমার দোআ গুলো কবুল করতেন। কারণ বহুবার এমন হয়েছে, কিছু কিতাব পড়তাম কিন্তু ভুলে যেতাম। এক পৃষ্ঠা পড়ে, পরের পৃষ্টায় গেলেই আগের পৃষ্ঠা ভুলে

যাই। এক্ষেত্রে বুঝে নিতাম, আল্লাহ আমাকে এই কিতাব থেকে হেফাজত করছেন। পরে ওটা রেখে দিতাম।

এভাবেই আলহামদুলিল্লাহ হক ও বাতিলের পার্থক্য করা শিখে গেলাম। আর যেসব ব্যাপারে খুব বেশি দ্বিধায় পড়ি সেসব বিষয়ে আলেমদের কাছে সশরীরে গিয়ে জেনে নেই। এতে করে তাদের সাথে আমার সুসম্পর্কও গড়ে উঠে আর আমার কদরও বাড়তে থাকে। কারণ আমি খুব গভীর ও সুক্ষ বিষয় নিয়ে তাদের প্রশ্ন করতাম। ফলে তারা কিছুটা আশ্চর্যও হতেন। কখনো কখনো সেসবের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দিতে পারতেন না। পরে দিবেন বলে আমাকে পরে আসতে বলতেন। আমিও এতে খুশি হতাম। কারণ আবার তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেতাম।

এভাবেই চলছে।

আমি এখন মোটামুটি নিজে চলার মতো মাছালা জানি এবং হক ও বাতিলকে পার্থক্য করতে পারি। আর এই জিনিসগুলো খুব দ্রুতই হয়েছে। আল্লাহ আমাকে খুব দ্রুত কবুল করে নিচ্ছেন। খুব অল্প সময়ের ভিতরে আল্লাহ আমাকে আমার পুরোনো লাইফ স্টাইল থেকে বের করে তাকওয়ার জগতে প্রবেশ করিয়েছেন।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য আমি সকল প্রকার সন্দেহজনক খাবার ত্যাগ করলাম। সাহাবীওয়ালা জিন্দিগি গড়ার চেষ্টায় আমার দিন রাত কাটে। তাকওয়ার খেলাফ সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। এতে আমার খুব উপকার হলো। আমি ঈমানের স্বাদ নিতে পারছি। নিজেকে আল্লাহর খুব কাছের মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন জান্নাতের ভিতরেই আছি আমি। প্রতিদিন ঘুমের ভিতরে খুব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখি। যা দেখে আমার মন খুশিতে ভোরে যায়।

প্রচলিত অপসংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি সরে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমার সারাদিনের সঙ্গী হচ্ছে কিতাব। আর বাহিরে বের হলে দ্বীনি ভাইদের সাথে কিছু সময় দেই। বিশেষ প্রয়োজনে আমার বন্ধু মুয়াজের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করি। এভাবেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম আমার এই পরিবর্তনে সবাই খুশি হয়। আমার বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন সবাই। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা আমার উপরে বিরক্ত হতে থাকে। কারণ আমি কঠোর ভাবে তাকওয়া মেইনটেইন করে চলি। যেমন গায়রে মাহরামদের সাথে পর্দা করা। সবসময় পায়জামা, পাঞ্জাবি ও টুপি পড়া। দাড়িও রেখে দিচ্ছি এক মুষ্ঠি। কোনো ফ্যামিলি প্রোগ্রামেও (অপসংস্কৃতিতে ভরপুর) যাই না। আমার এসব আচরণকে তাদের কাছে গোড়ামি মনে হতে থাকে। চিরচেনা লেকচার দিতে থাকে।

নিজের কাজিন বা চাচির সাথে আবার কিসের পর্দা? আর এই বয়সে এতো বড় দাড়ি রাখার কি দরকার? আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ কি হয়?? সবাই এসব করছে তো। তুমি এতো বাড়াবাড়ি কেন করছো? এতো গোড়ামি ভালো না। ইসলাম এতো কঠিন না। স্বাভাবিক জীবন যাপন করো।

আরো কত কথা। অথচ এগুলো যে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা এটা জানেইনা। কাটছাট করা মডারেট ও আধুনিক ইসলামই তাদের কাছে ইসলাম। তারা নিজেরা তো ইসলামের ধারে কাছেও নেই। কেউ যদি ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তারা এই রিমিক্স ইসলামকে পালন করার জন্য জোরজবরদস্তি করে।

আপনারা (পাঠক) যারা দ্বীনহীন পরিবারে হঠাৎ করে দ্বীনের সন্ধান পেয়েছেন এবং নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। তাই নিশ্চই আমার ওই অবস্থাকে অনুভব করতে পারছেন বলে আশা করছি। তবে আল্লাহ আমাকে এমন ঈমানী শক্তি দান করেছেন যে, তাদের এসব কথা

ও আচরণে আমি ভেঙে তো পরিইনি। বরং আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। আরো কঠোর হই। আরো সাবধান হই, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আমার মতোই দ্বীন চর্চায় ব্যস্ত রইলাম। কারো কথায় কোনো কান দিলাম না। এলাকার মুরুব্বীরাও আমার এই পরিবর্তন ও দাড়ি নিয়ে কথা বলে। এতো কম বয়সে এতো বড় দাড়ি রাখা উচিত না। সারাদিন মসজিদে পরে থাকা ঠিকনা। ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই বুঝায় চাকরি বাকরিও তো করা লাগবে। দুনিয়াও তো লাগবে। এভাবে জীবনযাপন করলে তো হবেনা।

মুরুব্বি হওয়াতে বেয়াদবি করতে পারিনা। মনে মনে বলি: "আমি যখন দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, জাহান্নামের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন কেউ আমাকে বুঝাতে আসেনি যে, এটা ভুল পথ। আখেরাতও তো লাগবে। জান্নাতও তো পেতে হবে। ইসলামের উপর ফিরে এসো আনাস। কেউ আমাকে বুঝায়নি। এখন, যখন আমি দুনিয়া ছেড়ে দ্বীনের উপর ফিরে এসেছি। সবাই আমার পিছনে লেগেছেন"?

তবে আল্লাহর বিশেষ রহমত থাকায় এসব পরিস্থিতি আমাকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি, আলহামদুলিল্লাহ। বরং আল্লাহ আমার অন্তরে হেকমত ঢেলে দিলেন। এসব পরিস্থিতি সামলানোর যোগ্যতা দান করলেন। কৌশলে উত্তর দেয়ার মতো এলম দান করলেন।

একবার এক মুরুব্বীকে হেকমতের সাথে একটা উত্তর দিলাম। তার ছেলে আমাদের বন্ধু ছিল। ঐযে প্রথম দিন আমরা যেই ৪ জন বন্ধু মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম, তাদের মধ্যে একজন। নাম হচ্ছে জাফর। আরেকজন ছিল সালাম। আমি আর মুয়াজ দুজনেই জাফর আর সালামকে দ্বীনের পথে আনার খুব চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে জাফর

আমাদের সাথে সময় দিতো। কিন্তু সালাম একেবারেই আসতে চাইতো না। তাই আমরা জাফরকেই ফিরানোর চেষ্টায় মনোযোগ দিলাম। আর এজন্যই জাফরের বাবা আমাদেরকে পছন্দ করতো না।

তিনি একদিন আমাকে আর মুয়াজকে বললেন: "তোমরা এখন কেন দাড়ি রাখতেছো? তোমরা তো চাকরিও পারবানা, বিয়েও করতে পারবানা। এটা তো দাড়ি রাখার বয়স না। আরো পরে রেখো"।

আমি আংকেলকে বললাম: "দেখুন আংকেল, একটা বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন তার চোয়ালে দাঁত থাকেনা। কারণ তখন তার সেটা প্রয়োজন নেই। যখন এক বছর বয়স হয় তখন দাঁত উঠা শুরু করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে উপযুক্ত সময়েই দাঁত দিয়েছেন। একইভাবে একটা শিশু দাড়ি নিয়েও জন্মায়না। এমনকি ১২/ ১৩ বছর পর্যন্তও দাড়ি গজায়না। ১৫/ ১৬ বছর বয়স থেকে দাড়ি উঠা শুরু করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা একটা ছেলের উপযুক্ত বয়সেই দাড়ি দিয়েছেন। যদি দাড়ি রাখার বয়স আরো পরে হতো, তাহলে তো দাড়ি আরো পরেই (৪০ / ৫০ বছর বয়সে) উঠার কথা। দাড়ি হচ্ছে পৌরুষত্বের প্রতীক। একজন পুরুষ দাড়ি রাখবে এবং তার পৌরষত্বের প্রদর্শন করবে এটাই স্বাভাবিক। এই দাড়িই তো নারী ও পুরুষের চেহারার পার্থক্য কারী। আল্লাহ মানব শরীরে যখন যেটা প্রয়োজন ঠিক তখনই সেটা দান করেন। সুতরাং বুঝা গেলো তরুণ বয়সের শুরু থেকেই দাড়ি উঠা এবং তা রেখে দেয়াটাই প্রাকৃতিক (আল্লাহর) নিয়ম। এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ। আমরাতো বরং অনেক দেরি করে ফেলেছি। আমাদেরকে তো আরো আগে থেকেই দাড়ি রাখা উচিত ছিল"।

আমার এই কথায় আংকেল একদম চুপ হয়ে গেলেন। এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরবর্তীতে আংকেল আর আমাদেরকে এসব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেনি। বা এসব বিষয়ে কিছু বুঝাতে আসেনি। কিন্তু তিনি তার ছেলেকে পূর্ণ দ্বীনের উপরে আসতে দিতে চান নি। আমরাও হাল ছাড়িনি। লেগে আছি। আলহামদুলিল্লাহ একসময় জাফর আমাদের সাথে সময় দেয়া শুরু করলো। এখন আমরা ৩ জন একসাথে দ্বীনের কাজ করি। পুরো এলাকায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকি। আমাদের ৩ জনের দেখা দেখি এলাকার মুরুব্বীরাও দাড়ি রাখা শুরু করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক যুবক ছেলে মসজিদ মুখী হয়েছে। এতে পুরো এলাকার চেহারাটাই পাল্টে গেলো। কেমন যেন এক রহমত ও প্রশান্তি কাজ করছে আমাদের এলাকার উপর।

একটি ভুল সিদ্ধান্ত:

এভাবেই চলছে। অর্থাৎ আমরা ৩ বন্ধু ও অন্যান্য দ্বীনি ভাইয়েরা মিলে পুরো এলাকায় দ্বীনের কাজ চালাচ্ছি।

এর মধ্যে একদিন আবার আমার ওই ভার্সিটি ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে জানালো সামনে নাকি ইয়ার ফাইনালের ভাইবা পরীক্ষা আছে। আবার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। জানতে পারলাম, এই পরীক্ষা নাকি ম্যাডামরা নিবে। এটা শুনে তো আমি পেরেশান হয়ে গেলাম।

অনেক ভাবার পর সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষাটা দিবোনা। কারণ গায়রে মাহরামদের সামনে বসে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই ভার্সিটিতে গেলাম না, পরীক্ষাও দিলাম না। বন্ধুরা ফোন করে জিজ্ঞাসা করছে, পরীক্ষা কেন দিলাম না। অন্য কথা বলে কাটিয়ে দিলাম। আর তাছাড়া এই দুনিয়াবী পড়াশুনাটাও ভালো লাগছিলোনা। সব কিছুতেই ইসলাম বিরোধী ঘন্ধ বিদ্যমান। পড়াশুনা ছেড়ে অন্য কিছু করতে মন চাচ্ছিলো। কিন্তু এখনই তো সেটা সম্ভব নয়। তাই জোর করেই চালিয়ে যাচ্ছি।

কিছুদিন পরে জানতে পারলাম এই ভাইবাটা কম্পলসারি ছিল। এটা ছাড়া ইয়ার চেঞ্জ হবে না। আগের ইয়ারেই থাকতে হবে। এবার তো আমি মহা দুশ্চিন্তায় পরে গেলাম। আরো পেরেশান হয়ে গেলাম। আব্বুও বিষয়টা জানার পর খুব রাগ হলেন। আর আব্বু তো এমনিতেই আমার এসবকে গোড়ামি মনে করেন। তার উপর আমি এই কাজ করে ফেলেছি। সব মিলিয়ে আমি খুব মুসিবতে পরে গেলাম। তাই বিষয়টার একটা সমাধান পাওয়ার জন্য আমার প্রিয় একজন মুফতি সাহেবের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। তিনিও আমাকে খুব বকা দিলেন। আমার এই কাজটা ভুল হয়েছে বলে পরবর্তীতে এমন কাজ না করার জন্য সাবধান করে দিলেন।

এবং এটাও বললেন, "তুমি যে এই পরীক্ষাটা দিবা না, এ ব্যাপারে কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে নিছো"? আমি না বলাতে তিনি আবারো আমাকে বকা দিলেন। আর সাথে এটাও বলে দিলেন, কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ না করে যেন, কিছু না করি। তার পর আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি তাহলে এই পরীক্ষাটা দিবো"? বললেন: "অবশ্যই দিবা"। এবং কিভাবে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবো, সেই ব্যাপারেও উনার সাথে পরামর্শ করে নিলাম। পরে সেই অনুযায়ী অনেক ঝামেলা পেরিয়ে আমাকে পরীক্ষাটার জন্য পুনঃ আবেদন করতে হয়েছে। অবশেষে আমি পরীক্ষাটা দিতে পেরেছি। তবে অনেক বেশি পেরেশানির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেদিনই আমি খুব ভালো করে বুঝলাম যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আবেগী না হয়ে বরং আলেমদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উনাদের সাথে পরামর্শ করার কারণে, আমার পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়ার প্রবণতাটাও চলে গেছে। অর্থাৎ পড়াশুনা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাই এখন কিছুটা যত্নশীল হয়েছি। যদিও দুনিয়াবী পড়াশুনা একদমই ভালো লাগতোনা। তবুও জোর করে পড়তাম। আল্লাহর উপর ভরসা করে পরীক্ষাগুলো দিতাম। এমনও হয়েছে যে, সিলেবাস বা বইয়ের বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু একদম বাস্তব কথা গুলোও পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়েছি। এভাবেই অনার্স লাইফটা (গ্রাজুয়েশন) শেষ করি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছায় রেজাল্টও ভালো হয়েছে।

গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর কিছুটা আনন্দ লাগছে। কিন্তু অন্তরের ভিতর থেকে প্রশান্তি পাইনা। এই পড়াশুনা গুলোতে একেবারেই মন বসেনা। তৃপ্তি পাইনা। মনে হয় যে, এর মধ্যে কোনো রহমত নেই, বরকত নেই। কিন্তু তারপরেও পড়তে হয়। কারণ আমি তো মাদ্রাসায় পড়িনি। তাই হুট্ করে পড়াশুনার ট্র্যাক চেঞ্জ করাটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। আর ওলামা হজরত গণও আমাকে এটাই বলেছেন এবং নিজের পড়াশুনার উপর

এস্তেকামাত থাকতে বলেছে। যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাই। তখন তারা আমাকে আমার সাবজেক্ট নিয়েই ভালো করে পড়াশুনা করতে বলেছেন।

আসলে তারা আমার মতো এরকম অনেক ছেলেকেই দেখেছেন, যারা হঠাৎ করে দ্বীনদার হয়ে অতি আবেগের কারণে আলেমদের সাথে পরামর্শ না করে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত (ভুল) নিয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করেছে।

আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন। আমিও তো ওই পথেই হাঁটা শুরু করেছিলাম। এরপর ফতোয়া ও মাসালা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম। ফলে আমার অনেক ভুল ভ্রান্তি দূর হয়ে গেলো, আলহামদুলিল্লাহ।

একটি হারাম সম্পর্কের আহব্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান:

কিছু সময়ের জন্য আবার আপনাদেরকে অতীতে নিয়ে যাচ্ছি। চলুন তাহলে আনাসের তরুণ বয়সে।

একটি সুপরিচিত স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর, আরেকটি জনপ্রিয় কলেজে ইন্টারে ভর্তি হয়েছে আনাস। অত্যন্ত স্টাইল করে চলে আনাস। কলেজের সবাই তাকে ফলো করে। আনাসের আম্মু, আনাসকে অনেক টাকা দিতো। তাই পোশাক আশাকের পিছনে খুব খরচ করতে পারতো আনাস। দেখতে সুদর্শন ও খুব বেশি ফ্যাশনেবল জীবন যাপনের জন্য কলেজের মেয়েরাও আনাসকে খুব পছন্দ করতো। অনেক মেয়েই আনাসের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতো। কেউ কেউ আরো একটু আগানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু আনাস এসব ব্যাপারে গুরুত্ব দিতোনা।

ও নিজের সম্পর্কগুলো বন্ধুত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতো। এর বেশি নিজেও আগাতো না, অন্য কাউকেও সুযোগ দিতো না। কলেজ জীবনে আনাস দারুন এক জীবন পার করছে। এর মধ্যেই আনাসের বাবাকে চাকরির খাতিরে সপরিবারে অন্য এক এলাকায় স্থানান্তর হতে হয়। প্রধান শহরের খুব কাছের এই এলাকাটি খুব একটা উন্নত নয়। নাগরিক সকল সুযোগ সুবিধা থাকলেও অনেকটা মফস্সলের মতোই। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। আনাসের বাবা আগেই একটি বাসায় ভাড়া নিয়ে রেখেছিলো।

তাই ওরা সপরিবারে গিয়ে ওই বাসায় উঠেছে। এলাকাটি আনাসের একদমই পছন্দ হয়নি। যেহেতু আনাস আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সেহেতু এই এলাকাটা ওর পছন্দ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া ওরা যেই এলাকায় ছিল, সেটাও আধুনিক এলাকা ছিল। আর বন্ধু বান্ধবের তো অভাবই ছিলোনা। তাই আনাস এই এলাকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলোনা। প্রতিদিন সে ঘুম থেকে উঠেই তার আগের এলাকায় চলে যায়। সারাদিন আড্ডা দিয়ে, রাতে ফিরে।

একদিন আনাস বাসাতেই ছিল। হঠাৎ বাসার বেল বাজায় দরজা খুলে দেখে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা কোরান শরীফ নিয়ে।

মেয়েটি বললো: " ভাইয়া আপনারা যেদিন আমাদের বাসায় (ওই মেয়েটা বাড়িওয়ালার মেয়ে ছিল) আসছিলেন, সেদিন একটা ভাইয়া (আনাসের একটা কাজিন) এই কোরানটা আমাদের কাছে রেখেছিলো। আপনাদের ঘরে তো রাখার কোনো জায়গা ছিল না তাই"।

আনাস "ও আচ্ছা" বলে কোরানটা রেখে দিলো।

এই বাড়িতে দুইটা ইউনিট ছিল। এক ইউনিটে বাড়িওয়ালারা থাকে। আরেক ইউনিটে অনাসরা। আবার এদের উভয়েরই গ্রামের বাড়ি একই বিভাগে। ফলে এই দুই পরিবারের ভিতরে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে আনাসের সাথেও ওই পরিবারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়। পরবর্তীতে এলাকার সাথেও এডজাস্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ওই মেয়েটা আনাসকে খুব সহযোগিতা করে। মেয়েটা আনাসের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী আর দুষ্ট। ওর নাম তুলি।

মাঝে মাঝে তুলি, আনাসের সাথেও দুষ্টামি করে। আনাসের কোনো বোন না থাকায়, আনাস ওকে বোনের মতোই স্নেহ করে। এবং ওর দুষ্টমিগুলোকে এনজয় করে। আনাস তুলিকে তুই করে বলে। ওদের সম্পর্কটা এখন একদম ভাই বোনের মতো।

আনাস যেদিন ঘরে থাকে, সেদিন বেশিরভাগ সময় তুলির সাথে গল্প আর দুষ্টামি করেই কাটে। এভাবে করে ওদের দুজনের খুব ভালো বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। আনাস মাঝে মাঝে তুলির পড়াশুনাতেও সহযোগিতা করতো। সে হিসেবে তুলি, আনাসের ছাত্রীও বটে। এখন তাদের মধ্যে ৩ টি সম্পর্ক বিদ্যমান। ভাই-বোন, ভালো বন্ধু এবং শিক্ষক-ছাত্রী। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায়, তুলির ভিতরে একধরণের মানসিক দুর্বলতা

আসতে থাকে। সে আরো বেশি কিছু চাচ্ছিলো। অর্থাৎ আনাসকে আরো আপন করে পেতে চাচ্ছিলো। আবার তুলির আম্মুও আনাসকে খুব পছন্দ করতো। তুলি এটা বুঝতে পেরে আনাসের প্রতি আরো বেশি দুর্বল হয়ে পরে। হৃদয় থেকে ভালোবেসে ফেলে। সে বিভিন্ন ভাবে আনাসকে এটা বুঝানোর চেষ্টা করে।

আনাস প্রথমে বিষয়টা বুঝতে পারেনি। পরবর্তীতে বুঝলেও না বুঝার ভান করে থাকতো। কারণ আনাস এ ধরণের কিছু চাচ্ছিলোনা। তুলি ইশারা ইঙ্গিতে বহুবার বিষয়টা, আনাসকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু, আনাস ইচ্ছা করেই না বুঝার ভান করে বিষয়টা এড়িয়ে যায়। কারণ আনাস জানে, এটা কিশোরী তুলির আবেগী কল্পনা। এই আবেগ বেশিদিন থাকবেনা। তাই আনাস তুলিকে ভালো করে পড়াশুনা করার পরামর্শ দেয়।

কিন্তু তুলি মেয়েটা এ ব্যাপারে বড়োই একরোখা। সে আনাসকে রাজি করিয়েই ছাড়বে। আবার আনাসের কাছে এগুলো নতুন কিছু নয়। স্কুল জীবন থেকেই আনাস এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আসছে। অর্থাৎ এর আগেও অনেক মেয়ে আনাসের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু আনাসের এসব ভালো লাগে না। তাই সবসময়ই এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করে চলে। এখনো একই রকম মানসিকতাই লালন করে আনাস।

কিছুদিন পর তুলি সরাসরিই বলে বসলো নিজের ভালো লাগা ও ভালোবাসার কথা। আনাস তুলিকে খুব বুঝালো। এগুলোর দ্বারা সম্পর্ক গুলো নষ্ট হয়ে যায়। তুই এখন কিশোর বয়সে। তাই সব কিছু রঙিন মনে হচ্ছে। এই আবেগ কেটে গেলে নিজেই লজ্জা পাবি। তাই এসব বাদ দে। কিন্তু তুলি তো নাছোড় বান্দী। কোনো ভাবেই সে বুঝতে চাইছেনা। ফলে বাধ্য হয়ে আনাসকে একটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

আনাস বলে: "ঠিক আছে হবে। কিন্তু এখন নয়। এখন আমরা বন্ধু হয়েই থাকবো। আমার ও তোর পড়াশুনা শেষ হোক, তারপর সিদ্ধান্ত নিবো"।

তুলি আনাসের এই সিদ্ধান্তে রাজি হয়। এখন সবকিছু স্বাভাবিক। আনাস যেহেতু তুলির পড়াশুনায় সাহায্য করে, বলতে গেলে পুরো দায়িত্বই নিয়ে নিছে, তাই দুইজনের বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়। তুলি নিজের ও আনাসের পড়াশুনা শেষ হবার অপেক্ষায় দিন কাটাতে থাকে। তুলি মেয়েটা আনাসকে সত্যিই অনেক ভালোবাসে। আনাস অতটা বুঝতে পারেনি। তুলি সবসময় আনাসের দিকে নজর রাখতো। কখন বাসা থেকে বের হয়? কখন ফিরে আসে? মাঝে মাঝে আনাসের জন্য অপেক্ষা করে। ফিরে আসলে গল্প করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবেই চলে প্রতিদিন।

এর মধ্যেই একদিন এক দ্বীনি ভাইয়ের দাওয়াত ও মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আনাসকে মসজিদমুখী করে দেন। এরপর আনাসের জীবনের মোড় কিভাবে সম্পূর্ণ ঘুরে যায় তা তো আপনারা (পাঠক) জানেনই।

আনাস তো এবার মাছালা জানে যে, গায়রে মাহরাম মেয়েদের সাথে প্রেম বা বন্ধুত্ব তো দূরের কথা বোনের সম্পর্কও রাখার সুযোগ নেই। তাই আনাস আল্লাহর ভয়ে তুলিকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করা শুরু করলো। তুলি বিষয়টা বুঝতে পেরে আনাসের কাছে ছুটে আসে। যেহেতু বাসায় এসেছে, বের করে তো দেয়া সম্ভব নয়। তাই আনাস মাথা নিচু করে তুলিকে ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। এবং বলে দেয়, যদি আল্লাহ আমাদের তকদিরে একসাথে হওয়াকে রাখেন, তাহলে তো আমরা একসাথে হবোই। আর যদি না থাকে তাহলে তো কিছু করার নেই। কিন্তু এভাবে গল্প করা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা হারাম। মারাত্মক গুনাহ। আনাসের সব কথা শুনার পর তুলি কোনো কথা না বলে, কান্না করতে করতে আনাসের একটা খাতায় কি যেন লিখছে। আনাস সেটা দেখেছে। কিন্তু আনাসের কিছু

করার নেই। লিখা শেষ করে তুলি চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলো। আনাস উঠে কাগজটা পরে দেখলো। অকৃত্তিম ভালোবাসার কথা লিখা। যে কারো হৃদয়কে নাড়া দিবে এই লিখাগুলো।

আনাস এবার বুঝতে পারলো, তুলি মেয়েটা অনেক বেশি ভালোবাসে আনাসকে। নিজের জীবনের চেয়েও বেশি। এর পরেও আনাস তুলির সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। তুলি কিছুদিন ফোনে (বাটন ফোন) যোগাযোগের চেষ্টা করে। আনাস ওই নাম্বারটা রিজেক্ট লিস্টে দিয়ে দেয়। সর্বশেষে আনাস একটা কড়া এস এম এস দিয়ে কঠোর ভাবে বকা ঝকা করে তুলিকে। এতে তুলি মনে খুব আঘাত পায়। এবং আর কখনো আনাসের সাথে সরাসরি যোগাযোগের চেষ্টা করেনি।

আনাস তুলিকে দূরে সরিয়ে দিলেও, তুলির জন্য দোআ করে। আল্লাহ যেন তুলিকে পর্দাশীল ও দ্বীনদার বানিয়ে দেন। আনাস প্রতিদিন ফজরের নামাজে যাওয়ার সময় দূর থেকে তুলির বাসার দিকে তাকাতো (অনাসরা অন্য আরেকটি বাসায় চলে গিয়েছিলো)। দেখতো ওর রুমে আলো জ্বলছে। এতে আনাস খুশি হয়। ভাবে তুলি মনে হয় ফজরের নামাজ পড়তে উঠেছে। মনে মনে আনাস তুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে আশা করছিলো। হঠাৎ হয়তো আনাস তুলিকে দেখবে, যে কিনা কালো বোরকার সাথে হাত মোজা, পা মোজা ও ৫ পার্টের হিজাব পড়ে আছে।

মনে মনে আনাসের এটাই আশা ছিল যে, তুলি যদি একদম আনাসের মতোই নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে নেয়, তাহলে তুলিকে নিজের জীবনে নিয়ে নিবে। সেই অপেক্ষাতেই রইলো আনাস। কিন্তু সেটা কাউকে জানতে বা বুঝতে দেয়নি। সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য আনাস গিয়ে একজন মুফতি সাহেবের সাথেও তুলির ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো। এই মুফতি সাহেব তুলিকে ছোটবেলায় আরবি পড়িয়েছেন। এবং তুলির পরিবার সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। আমার আর

তুলির বন্ধুত্বের কথা বলতেই তিনি বললেন: " খুব ভালো একটা মেয়ে তুলি। হাজারে একটা এমন সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিয়ে করে ফেলো"। আনাস তার কথায় আশ্বস্থ হলো। আর তুলির পরিবর্তনের জন্য দোআ ও অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুদিন পর আনাস শুনে, তুলির বিয়ে হয়ে গেছে। এতে আনাস খুব অবাক হয়ে যায়। যেই মেয়ে আনাসকে এতো ভালোবাসতো সে এরকম করে ফেললো??

আনাস তো ভেবেছিলো, তুলি আনাসের জন্য অপেক্ষা করবে এবং আনাসকে পাওয়ার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করবে। কিন্তু এটা কি হলো? প্রথমে আনাস বিষয়টা বিশ্বাসই করতে পারেনি। পরে জানলো, হা তুলির আসলেই বিয়ে হয়ে গেছে।

কিন্তু আনাস বিষয়টাকে সহজ ভাবে নিয়ে নিলো। কারণ সে তো তকদির সম্পর্কে জানে। আনাস বুঝে নিয়েছে, তুলি তার তকদিরে নেই। আর তাছাড়া আনাস ছোটবেলা থেকেই মানসিক ভাবে খুব শক্ত প্রকৃতির একটা ছেলে। তাই কোনো কিছুতে এতো সহজেই বিচলিত হয়না। বা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েনা, মাশাআল্লাহ।

সুতরাং, সে আবার নিজের দ্বীনি দাওয়াত ও পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলো। এভাবে গ্রাজুয়েশন শেষ করলো।

পোস্ট গ্রাজুয়েশন ও রিজিকের অন্বেষণ:

ভেবেছিলাম, পড়াশুনা ছেড়েই দিবো। বাকি জীবনটা খুব সাধারণ ভাবেই কাটিয়ে দিবো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো অন্যরকম ছিল। তাই পারিবারিক চাপে মাস্টার্সে ভর্তি হতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ক্লাসে একেবারেই যেতে মন চায়না। ঘরেই পড়ি। শুধু পরীক্ষার সময় গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসি। এদিকে আমাদের ফ্রেন্ড জাফর, তার বাবার চাপে পরে আগের দ্বীনহীন জীবনে ফিরে গেছে। মুয়াজও পারিবারিকভাবে খুব চাপে আছে। আমি আর মুয়াজ অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা একজন আরেকজনকে ভরসা দিয়ে দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওদিকে আমাদের দুজনেরই বাসা থেকে ইনকামের জন্য প্রেসার দেয়া হচ্ছে। মুয়াজ একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে। নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে একটা কোম্পানিতে। এর কিছুদিন পর আমিও নিজ এলাকার ভিতরে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করি। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পদেও কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। প্রতিষ্ঠানটা কয়েকজন আলেমের। তাই এখানে অন্যান্য অনেক আলেমের খুব আসা যাওয়া আছে। ফলে সব আলেমদের সাথে আমার সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা খুবই যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম।

তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই খুশি। আর এখান থেকে যা ইনকাম হয়, তা দিয়ে আমার মোটামুটি ভালোই চলছে, আলহামদুলিল্লাহ। পরে আমি মুয়াজকেও এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসি। এবার আমরা দুজন মিলে দ্বীনের কাজও করি আবার প্রাতিষ্ঠানিক কাজও করি। ভালোই চলছে আমাদের। মুয়াজ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড় ছিল। তাই তার বিয়ে করার আগ্রহটা আগেই তৈরী হয়েছে। ওর বিয়ের জন্য আমিও বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করছি। আমার কিছু আত্মীয় স্বজনের সাথেও কথা বলেছি।

দ্বীনের অর্ধেক পূরণ:

মুয়াজের জন্য আহলিয়া খুঁজতে আমার এক আত্মীয়ের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি। কারণ তার সাথে অনেক দ্বীনদার মানুষদের পরিচয় আছে। ফলে তিনি হয়তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে আশা ছিল। উনার নিজের একটা বিবাহ উপযুক্ত মেয়ে ছিল। কিন্তু এই মেয়েটার তকদির ছিল বড়োই আজব। খুব অল্প বয়সেই বড় বড় দুটি দুর্ঘটনা ঘটে যায় মেয়েটার জীবনে। তাই আমার ওই আত্মীয়া (মাহরাম) এই মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন পরীক্ষা দিতে হবে, তিনি তা ভাবতেই পারেন নি। যেদিন আমি মুয়াজের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছি, সেদিন তিনি "নিসার" ব্যাপারে আমাকে অনেক কিছু বললেন। উনার মেয়ের নাম ছিল "নিসা"। নিসাকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। খুব ভালো ও ভদ্র একটা মেয়ে। কিন্তু আমি দ্বীনদার হওয়ার পর আর ওকে দেখিনি। তাই এখনের অবস্থাও জানি না। আমি বুঝতে পারলাম, উনি নিসার বিয়ের প্রসঙ্গটা আনতে চাচ্ছেন। এবং উনিও আমার এই পরিবর্তনে খুব খুশি হয়েছেন। তো সব মিলিয়ে উনার মূল আকাঙ্ক্ষাটা আমি বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু আমি ওই মুহূর্তে বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ একে তো আমার স্টুডেন্ট লাইফ শেষ হয়নি। তার উপর ভালো কোনো ইনকামও নেই। আবার বাসা থেকেও একদমই মেনে নিবে না। তাই আমি আগ্রহ দেখলাম না। ওখান থেকে চলে আসলাম। বাসায় আসার পর বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবা শুরু করলাম। আবার আল্লাহর রাসূলের বিবাহিত জীবনের সৌন্দর্যতার কথাও মনে পড়লো। তাই আমার মানসিকতাতেও পরিবর্তন আসলো।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, নিসাকেই বিয়ে করবো, আল্লাহর জন্য।

কারণ ওকে বিয়ে করলে অনেকগুলো সুন্নত আদায় হবে। আর আমি নেকীও পাবো। তাই আমি আমার নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্যদের স্বার্থের কথা ও দ্বীনের কথা চিন্তা করে, এ ব্যাপারে আগ্রহী হলাম। এখানে আমি কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখেছি।

১) ধূর্ঘটনা কবলিত একটি মেয়েকে উদ্ধার করার সুন্নাহ আদায় হবে।

২) মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আমার আত্মীয়াকে বিপদ মুক্ত করার সুন্নাহ আদায় হবে।

৩) কম খরচে, সাহাবীওয়ালা বিয়ের সুন্নাহ আদায় হবে। এতে আমার ও উনার পরিবার অর্থ ব্যায়ের বোঝা থেকে বেঁচে যাবে। কারণ দুই পরিবারই ঋণগ্রস্থ অবস্থায় আছে।

৪) আমার আম্মু যেহেতু মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিল। এবং সম্পূর্ণ একা থাকার কারণে সেটা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তাই "নিসা" আমাদের ঘরে আসলে আম্মুর একাকিত্ব দূর হবে এবং সুস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

৫) আমরা দুজন মিলে এলাকায় দ্বীনের কাজ করবো। কারণ এলাকায় পুরুষদের ভিতরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছালেও মহিলাদের কাছে ঠিক মতো পৌঁছাচ্ছিল না।

মোটকথা আমি আমার নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে, আমার আব্বু, আম্মু, ওই আত্মীয়া এবং নিসার স্বার্থের দিকে, আর দ্বীনের মেহনতের দিকে তাকিয়েছি।

আর বিনিময় আশা করেছি একমাত্র আল্লাহর কাছে। কারণ নিসার জীবনে যে দুর্ঘটনা গুলো ঘটেছে, এতে একটা যুবক ছেলের বড় ধরণের একটা প্রাপ্তির অনুপস্থিতি

বিদ্যমান। যেটা সব যুবকেরই স্বপ্ন থাকে। কিন্তু তবুও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ আদায়ের জন্য, আমি আমার সব স্বপ্নকে কুরবানী করে দিয়েছি।

আর তাছাড়া নিসা তার পরিবারের একজন সদস্যের দ্বারা প্রায়ই সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতো। এই বিষয়টাও আমার অন্তরে নিসার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে।

তাই সব কিছু আব্বু আম্মুর কাছে খুলে বললাম আর নিসাকে বিয়ের কথাও তাদেরকে বুঝলাম। আম্মু রাজি হলেও আব্বু একেবারেই রাজি হচ্ছিলোনা। পরে আম্মু আমাকে অভয় দেয় এবং আব্বুকে সামলাবে বলে কথা দেয়। ফলে আমি এক জুমাবারে গিয়ে নিসাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। খুব সাধারণ ভাবে নিসা আমার সামনে এসেছে। ছোট্ট অবস্থায় দেখেছিলাম। এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। যেমন লম্বা তেমন সুন্দরী, মাশাআল্লাহ।

সাথে যখন শুনেছি, নিসা ৫০দিনের একটি মুয়াল্লীমা ট্রেনিং করেছে, তখন তো আমি মহা খুশি। তাই নিসাকে সব খুলে বললাম। অর্থাৎ আমি যে ওকে নিয়ে দ্বীনের কাজ করতে চাই এবং আম্মুর একাকিত্ব দূর করাতে চাই। আর নিজেদেরকে পুরোপুরি দ্বীনের জন্য কুরবানী করতে চাই। সব ইচ্ছার কথা ওকে বললাম। ও এগুলো পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে, নিসা পারবো ইনশাআল্লাহ বলে আমাকে আশ্বাস দিলো। আমি আরো খুশি হলাম।

সব কথা শেষ করে, নিসাকে একটা কিতাব হাদিয়া দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় এসে আম্মুকে সব বলার পর আম্মু নিসাকে বিয়ের অনুমতি দিলো। ফোনে কথা পাকাপাকি করে আমি পরের জুমাবারে একটা চকলেট কালারের মাদানী পড়ে

নিসাদের বাসায় চলে আসলাম। এশার নামাজের পর ওই মসজিদের ইমাম সাহেবের হুজরা খানায় বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। মোহরে ফাতেমীতে দুজন মুফতি সাহেব এবং আরো কয়েকজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে খুব সাদামাটা ভাবেই বিয়ে হয়ে গেলো আলহামদুলিল্লাহ। ভিতরের রুমে গিয়ে নিসার কপালে হাত রেখে একটা দোআ পড়লাম। নিসা একটা নীল শাড়ি পড়ে আছে। খুবই সুন্দর লাগছে নিসাকে। এরপর আমরা বাসায় (নিসাদের) চলে আসলাম। ঘরে এসে দুজনে শুকরিয়ার নামাজ আদায় করলাম। পরের দিন সকালে নিজের বাসায় ফিরে আসলাম।

এদিকে আম্মু, আব্বুকে ম্যানেজ করে ফেলেছে। তাই পরের সপ্তাহে নিসাকে বাসায় নিয়ে আসলাম। নিসা খুব ভালো একটা মেয়ে। ওকে এতো সাধারণ ভাবে আনা হয়েছে, অথচ এতে ওর একটুও আপত্তি ছিলোনা। এবার আমি ওকে নিয়ে পুরোদমে দ্বীনের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছি। মোটামুটি শুরু করেও দিয়েছি। ঘরে তালিম করি। বাহিরেও দাওয়াতের কাজ করি। দ্বীনের কাজেই বেশি সময় ব্যায় করি।

কালো জাদুর প্রভাব ও জিনের আছর:

মাঝে মাঝে আমরা দুজন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে সফরেও বের হই।

কিন্তু আব্বু আম্মুর কাছে এগুলো বাড়াবাড়ি মনে হয়। তাদের সাথে মনোমালিন্য শুরু হয়। আমি বলি একরকম। আর আব্বু বলে আরেকরকম। ফলে কিছুটা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি, আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হতে চাই, তা বোধহয় সফল হবেনা। দিন দিন ঘরের ভিতরে মনোমালিন্য বেড়েই চলছিল। ফলে নিসার সাথেও আমার সম্পর্কের উন্নতিতে বাধা পড়লো। আমরা একে অপরকে চিনার ও বুঝার সুযোগই পেলামনা। কেমন যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। এমনটা হওয়ার কথাই ছিলোনা। কিছুই বুঝতে পারছিনা।

আম্মুর সাথেও নিসার সম্পর্কটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার পর একটা সন্দেহ আমার মাথায় দানা বাঁধলো। আমাদের পাশের এক লোক কালো জাদুকর। এবং সে এলাকার সবারই কমবেশি ক্ষতি করে। আমরা এর আগেও তার দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে সেই কিছু করেছে। কারণ একদিন নিসাকে নিয়ে বের হওয়ার সময় সে আমাদের বিয়ের কথা ও দেশের বাড়ি কোথায় জেনে নিয়েছিল। তাই মনে হচ্ছে সেই কিছু করেছে। নয়তো হঠাৎ করে সবকিছু এমন এলোমেলো হয়ে গেলো কেন? আমাদের সুন্দর সংসারে অশান্তির কালো ছায়া নেমে আসলো কেন? কিছুদিন পর আমার ধারণাই সত্যি হলো। আমরা একটা কুফুরী তাবিজ পেলাম। ফলে সবাই বুঝতে পারলাম, লোকটা আমাদের পরিবারের উপর জাদু করেছে। একজন মুফতি সাহেবকে তাবিজটা দেখানোর পর, তিনি স্বীকৃতি দিলেন যে, আমাদের পরিবারের উপর জাদু করা হয়েছে।

আমরা তাবিজটা নষ্টের ব্যবস্থা করলাম। এরপর কিছুদিন আমরা ভালোই ছিলাম। তারপর আবার একইরকম। কারো সাথেই কারো এডজাস্ট হচ্ছেনা। না আম্মুর সাথে

নিসার। না আমার সাথে নিসার। না আমার সাথে আব্বু আম্মুর। দোটানার মধ্যে পরে গেলাম আমি আর নিসা। আবার নিসার সাথেও আমার কিছুটা মনোমালিন্য হওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমি ওকে যেমন দ্বীনদার ভেবেছিলাম, ও আসলে সেরকম নয়। অর্থাৎ, ও দ্বীনদার তো অবশ্যই কিন্তু আমার আশানরুপ নয়। ও আমার মতো হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আব্বু আম্মুর জন্য পারছিলোনা। নতুন বৌ, বয়সও তো বেশি নয়। যেমন সাপোর্ট পাওয়া উচিত তাও পাচ্ছেনা।

আমিও ওকে পরিপূর্ণ রূপে সাহায্য করতে পারছিনা। যেই আশা নিয়ে নিসাকে বিয়ে করে এনেছি, সে আশা গুলো পূরণ হবে বলে মনে হচ্ছেনা। কমবেশি প্রতিদিনই আমাদের ঘরে এসব নিয়ে ঝগড়া ঝাটি চলে। ১/২ দিন ভালো থাকলেও বাকি ৫/৬ দিন আমাদের গন্ডগোলের মধ্যেই কাটে। এবার আমার মনে হচ্ছে, সম্ভবত ওই লোকটা (কালো জাদুকর) বৌ শাশুড়ির মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে রাখার জাদু করে রেখেছে। যদিও এটার কোনো প্রমান আমরা পাইনি, তবুও এমনটাই আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। নাহলে আমাদের এতো সুন্দর ও ছোট্ট একটি পরিবারে কেন হঠাৎ করেই এমন অশান্তি নেমে আসবে?? সব মিলিয়ে অবস্থা এতটাই ভয়াবহ হলো যে, আমার সাথে নিসার ডিভোর্স হয়ে যায় যায় অবস্থা।

তাই সম্পর্কটা বাঁচানোর জন্য নতুন মেহমানের (উম্মত) কথা চিন্তা করলাম। আল্লাহর কাছে দোআ করলাম। আল্লাহ কবুল করলেন। আমার আহলিয়া হামেলা হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অবস্থায়ও ওর যতটুকু সাহায্য, সেবা এবং যত্ন পাওয়ার কথা তাও পেলোনা। আমি যথাসাদ্ধ ওকে সাপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। আম্মুর সাথে দিনকে দিন নিসার সম্পর্কের অবনতিই হচ্ছে।

কখনো কখনো আম্মুর একটা ভয়াবহ রূপ আমরা দেখতে পাই। যেটা কোনো স্বাভাবিক বা সাধারণ মানুষের হয়না। এতে আমার মনে হলো, আম্মুর উপর জিনের আছর আছে। আমার এই মনে হওয়াটা বাস্তব প্রমাণিত হলো সেদিন, যেদিন আমরা আম্মুর কণ্ঠের পরিবর্তন শুনেছিলাম আর আমরা সবাই মিলেও আম্মুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আম্মুর সাথে জীন আছে। আর এই জিনটাই হয়তো আম্মু আর নিসার মধ্যে গন্ডগোল লাগিয়ে রেখেছে।

কিন্তু এখন কথা হলো, এই জিনটা কি ওই জাদুকর লোকটা চালান দিয়েছে? নাকি পুরোনো কোনো জীন? কারণ আমার মনে আছে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও আম্মুর ভিতরে অদ্ভুত আচরণ দেখতে পেয়েছিলাম। আর আম্মু যেহেতু অত্যন্ত ফর্সা ও সৌন্দর্যতার অধিকারী ছিলেন, এবং গ্রামে বড় হয়েছেন। তাই আমি কিছুটা দ্বিধায় পরে গেলাম যে, এই জিনটা কি গ্রাম থেকেই আম্মুর উপর ভর করে আছে? নাকি আমাদের পাশের লোকটার পাঠানো জীন?

তবে আমি এটুকু নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, আম্মুর সাথে জীন আছে। এখন পুরোনো হোক বা জাদুকরের পাঠানো হোক।

আমি আবার বিষয়টাকে অন্যরকম ভাবে সমন্বয় করে নিছি। যদি এটা পুরোনো জীন হয়, তাহলে ওই জাদুকর হয়তো তার জাদুর মাধ্যমে (নিজের কারিন জীন বা অন্য কোনো উপায়ে) এই জিনকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ সে পুরোনো জিনকে দিয়েই কাজ করাচ্ছে। আর এই জাদুকরের জাদুর ব্যাপারে আমি মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। কারণ আমি নিজেও তার জাদুর দ্বারা ভুক্তভোগী। অনেকদিন আগে তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এরপরেই আমি খুব অসুস্থ হয়ে যাই। আমার মাথায় এতো তীব্র যন্ত্রনা হতো যে আমি কোনো ভাবেই সহ্য করতে পারতাম না। খুব খুব কষ্ট হতো। ভয়ংকর কষ্ট। এটা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

তাই আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিয়েছি, অর্থাৎ রুকিয়া করিয়েছি। দীর্ঘ এক বছর আমি কষ্ট পেয়েছি। একসময় আল্লাহ তায়ালা সুস্থতা দান করেছেন। তারপর কালো জাদু নিয়ে আমি পড়াশুনা শুরু করি, যাতে এগুলো সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। যার কারণে এখন আমি জাদু ও জীন সম্পর্কে মোটামুটি অনেক কিছুই জানি ও বুঝি।

ফলে আম্মুর ব্যাপারটাও আমি ধরতে পেরেছি। তাই এই বিষয়গুলো আব্বুর সাথে আলোচনা করলাম। আব্বু জীন ও জাদু সম্পর্কে জানলেও আমার কথা গুলো উড়িয়ে দিলেন। তিনি তো কথিত আধুনিক মানসিকতার মানুষ। তিনি এসব বিশ্বাস করেন না। তাই আমার কথাগুলো আমলে নিলেন না। বরং তিনি আম্মুকে সাইক্রিয়াট্রিস্টের (মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ) কাছে নিয়ে গেলেন। জনপ্রিয় একজন চিকিৎসক আম্মুকে মেরাথন চিকিৎসা দেয়া শুরু করলেন। প্রথম প্রথম কিছু ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছিলো। কিন্তু পরে আবার একই রকম। আম্মু ঔষধও খেতে চায়না। ডাক্তারের কাছেও যেতে চায়না। আব্বু আবার জোর করে আম্মুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার আবার ঔষধ দিলেন। প্রথম কিছুদিন সব ঠিক থাকলেও আবার একই রকম। ঔষধ ঠিক মতো না খাওয়ায় আম্মু সুস্থও হচ্ছিলোনা। আব্বুতো কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু আমি তো সব কিছুই বুঝছিলাম। আমি জানি আম্মুর সাথে থাকা জিনটাই আম্মুকে ঔষধ খেতে দিচ্ছেনা।

আমি বিষয়টা আবার আব্বুকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম এবং একজন রাকির (যিনি কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করেন) কাছে নিতে বললাম। কিন্তু আব্বু আমার কথাকে গুরুত্ব দিলেন না। তিনি ডাক্তারের পিছনেই লেগে আছে। অথচ কোনোই লাভ পাচ্ছে না। আমিও চুপ হয়ে গেলাম। ঐদিকে আম্মুর রোগ দিন দিন বাড়তেই থাকলো। অর্থাৎ নিসার সাথে আম্মুর সম্পর্কের খুব অবনতি ঘটলো। এর প্রভাব আমার জীবনেও পড়ছে।

আমি যখন আল্লাহর রাসূল ও তার বিবিদের (রা:) বিবাহিত জিন্দেগীর কথা গুলো পড়তাম, তখন আমিও আমার বিবিকে নিয়ে এমন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। ওই জীবন তো দূরের কথা সম্পর্ক টিকানোই দায় হয়ে গেছে। আবার নিসার কিছু স্বভাবের সাথেও আমি এডজাস্ট করতে পারছিলাম না। সবমিলিয়ে লেজে গোবরে অবস্থা। তারপরেও সবর করলাম। নিজের স্বার্থ আর স্বপ্নগুলোকে তো কুরবানী করেছিই, সুতরাং আর হারানোর কিছু নেই।

অপেক্ষা করছি উম্মত আসার জন্য। যদি এর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এভাবে টানাহেঁচড়ার মধ্যে দিয়ে প্রায় ৮/৯ মাস কেটে গেলো।

হামেলা নিসা, পর্যাপ্ত সেবা যত্ন থেকেও বঞ্চিত হলো। এরই মধ্যে উম্মত আসারও সময় হয়ে গেছে। নিসা তার বাবার বাড়িতে আছে। আমি আল্লাহর রাস্তায় সফরে আছি। সফর থেকে যেদিন ফিরেছি, সেদিন সন্ধ্যায় শুনি নিসা খুবই অসুস্থ। আমি সাথে সাথেই রওয়ানা দিলাম। পথেই শুনি আল্লাহ আমাদেরকে একটা মেয়ে সন্তান দান করেছেন। আমাদের বাসা থেকে নিসাদের বাসা অনেক দূরে। তাই পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওখান থেকে অনেক গুলো ফোন এসেছিলো, আমি ধরতে পারিনি। অবশেষে বাসায় পৌছালাম।

রাত তখন ১২টা।

নিসার রুমে গিয়ে দেখি দুটো বাচ্চা। আমি তো অবাক। তার মানে যমজ বাচ্চা হয়েছে??? এরপর পর জানলাম সেখানে একটা মেয়ে, আরেকটা ছেলে!! এটা তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সুবহানআল্লাহ, সুবহানআল্লাহ। আল্লাহর কি কুদরত। ঘরের সবাই অবাক এবং খুশি। আমিও অত্যন্ত খুশি। মা ও বাচ্চারা সবাই পূর্ণ সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য সবকিছু খুব সহজ করে দিছিলেন। আমি তো সফরে ছিলাম। কিছুই জানতে পারিনি। ঘরেই খুব সহজে একজন দাই মায়ের দ্বারা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই হয়ে গেছে। যদিও বাহিরে একটা এম্বুলেন্স দাঁড়া করানো ছিল। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে যেন হাসপাতালে নেয়া যায়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, সেটার প্রয়োজন পড়েনি।

কিছুদিন পরে আরো একটা কুদরতের কথা জানতে পারলাম। আমার ছেলে নাকি সুন্নতে খৎনা সহই জন্ম গ্রহণ করেছে। বিষয়টা কতটা আশ্চর্য জনক। একে তো যমজ বাচ্চা ঘরে হয়েছে। তার উপরে একটা ছেলে, একটা মেয়ে। আবার ছেলেটা কিনা সুন্নতে খৎনা সহ দুনিয়াতে এসেছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। তিনি কতগুলো কুদরত একসাথে আমাকে দেখিয়েছেন।

এই কথাগুলো যেই শুনে, সেই আশ্চর্য হয়ে যায়। আর মন থেকে বলে সুবহানআল্লাহ।

আমার পরিবারের লোকেরাতো প্রথমে উম্মত আসার খবর শুনে খুশি হয়নি। তারা চেয়েছিলো এগুলো আরো পরে হোক। এমনকি তারা নষ্টও করে ফেলতে বলেছিলো। কিন্তু এই খবরে তারাও খুব খুশি হয়েছে। আসলে ওই সময় আমি আল্লাহর খুশিকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। আমি তো জানি যে, কেউ যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোনো মাখলুককে অসন্তুষ্ট করে, তখন আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীতে উভয়কেই খুশি করে দেন। অন্যদিকে কেউ যদি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে খুশি করার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ উভয়কেই পেরেশানিতে ফেলে দেন। তাই আমি আল্লাহকেই খুশি করার চেষ্টা করেছি। ফলশ্রুতিতে এখন সবাই সন্তুষ্ট, আলহামদুলিল্লাহ।

নিজের নাতি নাতনির জন্য আব্বুই (বাচ্চাদের দাদা) আকিকার ব্যবস্থা করেছে। আমরা সবাই মিলে দুইজনের দুটি সুন্দর নাম দিয়েছি। ছেলের নাম আলিফ আর মেয়ের নাম মিম। সব মিলিয়ে ভালোই পার হচ্ছে।

মনের ভিতরে একটা আশার আলো জলে উঠেছে। ভাবছি এবার বোধহয় আমাদের পরিবারে সুখ শান্তি ফিরে আসবে। ২/৩ মাস পর মা ও বাচ্চাদেরকে আমার বাসায় নিয়ে আসলাম। বাসায় আনার পর বুঝলাম, বাচ্চা পালা কতটা কঠিন। তার উপর যমজ বাচ্চা। কষ্টের উপর কষ্ট। তবে মাশাআল্লাহ, নিসাকে আল্লাহ যথেষ্ট সবর শক্তি দান করেছেন। তাই সুন্দর করে সামলাতে পারছিলো।

কঠিন ও বাস্তব জীবনের মুখোমুখি:

কিন্তু কয়েকমাস পর আবার সেই গন্ডগোল শুরু হয়ে গেলো। আম্মুর সাথে নিসার এডজাস্ট হচ্ছেইনা। অবস্থা এতটাই ভয়াবহ হলো যে, আমাকে বাধ্য হয়ে ঘর ছাড়তে হলো। কারণ এখানে থাকলে বড় ধরণের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আর তাছাড়া আমাদের দ্বীন তো ধ্বংস হবেই।

যেদিন ঘর থেকে বের হই, সেদিন ঘরের পরিস্থিতি খুব খুব খারাপ ছিল। রাতের বেলায় বের হয়ে আসি। আমার বন্ধু মুয়াজ যে বাসায় ভাড়া থাকতো, সেটি এখন খালি পরে আছে। কারণ ওর আহলিয়া হামেলা থাকায় বাবার বাড়িতে ছিল। মুয়াজও নিজের বাবার বাসায় ছিল। তাই গিয়ে মুয়াজের বাসায় উঠি।

সেখানে খুব কষ্ট করে ১ / ২ মাস থাকি। এখন যেহেতু মুয়াজের পরিবারে ফিরে আসার সময় হয়েছে, তাই আমাকে তো অন্য বাসা দেখতেই হবে। দুই রুমের ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া নেই। দোতালায় দক্ষিণ মুখী বারান্দা। আমাদের জন্য একদম পারফেক্ট। মনটা যদিও খারাপ তার পরেও বাস্তবতাকে মেনে নিলাম। সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু করলাম। ধীরে ধীরে এডজাস্ট হয়ে গেলো। এখন আমি আর নিসা, আমাদের দুই সন্তান আলিফ আর মিমকে নিয়ে ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ। সাংসারিক আসবাব পত্রের অনেক কিছুই কিনা হয়ে গেছে। আব্বু মাঝে মাঝে বড় বড় বাজার গুলো করে দেয়। আবার নিসার বাসা থেকেও পাঠানো হয়। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম না কারো কিছু গ্রহণ করতে। তাই নতুন একটি কর্মের সন্ধান করতে শুরু করলাম। যেখানে আমার ইনকাম আরো বেশি থাকবে এবং একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি।

এর মধ্যে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সার্টিফিকেট চলে এসেছে। যেহেতু আমার ব্যবসা করার মতো পুঁজি, যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই তাই বিভিন্ন জায়গায় চাকুরীর জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু মন মতো হচ্ছেনা। ভালো কিছু জায়গায় যদিও সুযোগ পাচ্ছি, কিন্তু সেখানে দাড়ি কাটতে হবে। সেটা তো আর সম্ভব নয়। তাই কিছুটা হতাশায় পড়ে গেলাম।

সব মিলিয়ে দ্বীনের কাজেও কিছুটা গাফলতি এসেছে। আগের মতো সেই তাকওয়া নেই। অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছি। আল্লাহর কাছে খুব দোআ চালিয়ে যাচ্ছি একটা ভালো রিজিকের জন্য। কিছুদিন পর আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানিতে আমার রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

শুরু হলো আরেক বাস্তব ও বন্দি জীবন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে। কখনো কখনো ফিরতে এশাও হয়ে যায়। আসার সময় বাজার করে নিয়ে আসি। শুধু রাতে খাওয়ার সময় আহলিয়া ও বাচ্চাদেরকে সময় দিতে পারি। বাচ্চারাতো বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই থাকে। ওদেরকে আর সময় দেয়া হয়না। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন ঝামেলার কারণে আমরা স্বামী স্ত্রী নিজেদেরকে বুঝে নেয়ার সময় পাইনি। এখন আলাদা বাসায় থাকার কারণে আমাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার যা একটু সুযোগ হয়েছে তাও অফিসের জন্য সম্ভব হচ্ছেনা।

একদিন যা ছুটি পাই, তাও বিভিন্ন ঘরোয়া জমা কাজ এবং আম্মুর কাছে যাওয়ায় সেদিনও ঠিকমতো নিজের আহালকে সময় দিতে পারিনা। আম্মুর কাছে না গেলে,

আম্মু খুব মন খারাপ করে এবং কান্নাকাটি করে। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে যেতেই হয়। সব মিলিয়ে নিসার সাথে আমার ভুল বুঝা বুঝি আর দূরত্ব রয়েই গেলো। আর নিসা সারাদিন একা একা থাকায় কিছুটা মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ও যেহেতু সারাদিন আমাকে পায়না, তাই রাতে আমার সাথে একটু গল্প করতে চায়। কিন্তু আমি সারাদিন অফিস করে ২ / ৩ ঘন্টার জ্যাম ধাক্কিয়ে বাসায় ফিরে খুব ক্লান্ত থাকি। আর সময় দিতে পারিনা। ঘুমিয়ে পড়তেই হয়। কারণ সকালে তো আবার অফিসে যেতে হবে। নিসা এই বিষয়গুলো বুঝতোনা। ফলে ওর সাথে আমার জগড়া বেঁধে যেত। এছাড়া আম্মুর সাথেও ফোনে বিভিন্ন কথা বার্তার কারণে নিসার মনটা বেশিরভাগ সময় খারাপই থাকতো।

আমরা নতুন দম্পতি হিসেবে যে সাপোর্ট পাওয়ার কথা ছিল তা মোটেও পাইনি। টুকটাক যা পেয়েছি, তার চেয়ে মুসিবতেই বেশি পড়েছি। এসব কিছুর কারণে আমিও ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে লাগলাম। হতাশা ভালো করেই পেয়ে বসলো। কোনোভাবেই শান্তির মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। কিতাবের সাথে বাস্তবতাকে মিলাতে পারছিনা। কিতাব পড়ে পড়ে সুন্দর এক ইসলামী জীবনের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম , তা বাস্তব জীবনে এপ্লাই করতে পারছিনা। বরং বাস্তবকে দেখছি অত্যন্ত নিষ্ঠুর রূপে। ইসলামী জীবন তো দূরের কথা ঈমানের উপর টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই সময় শয়তান আমাকে খুব ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলো। সব সময় ভাবনা আসে, আমি একটা সুন্দরী মেয়ের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আল্লাহর ভয়ে। অথচ সেখানে অনুগত রূপবতী মেয়ে এবং সম্পদ দুটোই পেতাম। নিজের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে একটা বিপর্যস্ত পরিবারের দুর্ঘটনা কবলিত নির্যাতিত একটা অসহায় মেয়েকে বিয়ে করেছি

সুন্নাহ আদায়ের জন্যে। সবকিছুর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন পরিপূর্ণ রূপে দ্বীনের উপর চলতে পারি।

কিন্তু আমার সকল চেষ্টা, প্রচেষ্টা আর স্বপ্ন গুলো ব্যার্থ হয়ে গেছে। কি পেলাম আমি? হতাশাগ্রস্থ হৃদয়ে শয়তান ভালো করেই বাসা বেঁধেছে। শয়তান চাচ্ছে আমাকে একেবারেই দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে। আমি এখন অনেকটাই বিপর্যস্ত। শুধু বাহ্যিক ভাবে দ্বীনের লেবাস আছে। কিন্তু আগের সেই তাকওয়া নেই, আলেমদের কাছে আসা যাওয়ায়ও নেই, কিতাবের অধয়নও নেই, দ্বীনের মেহেনতও নেই, ফলে ঈমানের স্বাদও অনুভব করতে পারছিনা। আবার অফিসের অনেক নিয়ম কানুনের বেড়াজালে আটকে অবস্থা আরো খারাপ। আর এখানে অপসংস্কৃতিগুলো আমাকে আরো বেশি পেরেশান করে তুলেছে। যেগুলো চিরজীবনের জন্য ছুড়ে ফেলে দিছি, সেগুলোই এখানে সবাই প্রাকটিস করে। একজন ঈমানদারের জন্য এমন পরিবেশে থাকাটা খুবই কষ্টকর। কিন্তু আমি তো নিরুপায়। এই মুহূর্তে চাকরিটা ছাড়াও সম্ভব নয়। আর দারিদ্রতা তো মানুষকে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু এভাবেও ভালো লাগছেনা। তাই আল্লাহর কাছে খুব দোআ ও কান্নাকাটি শুরু করলাম। আল্লাহ যেন আমাকে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেন অথবা সবর করার শক্তি দান করেন।

প্রশান্তির ভাবনাগুলো:

আলহামদুলিল্লাহ, তিনি আমার দোআ কবুল করলেন। আমার ঈমানী শক্তিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমাকে ফেতনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া থেকে হেফাজত করলেন। অফিসের সকল প্রকার অপসংস্কৃতি থেকে নিরাপদ রাখলেন। আমার জন্য কর্মস্থলকে অনেকটা অনুকূল করে দিলেন। কিন্তু আমার সাথে নিসার এবং নিসার সাথে আম্মুর সম্পর্কটা তখনও উন্নত হয়নি। আগের মতোই একটা গ্যাপ রয়ে গেলো। এই বিষয়টা নিয়ে আবার চিন্তা করছিলাম। এ সময় আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে কয়েকটি কথা ঢেলে দিয়ে আমাকে প্রশান্তি দান করলেন। ঐযে আমার মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন ঘুরছিলো, এতো এতো কুবানির পর আমি কি পেলাম?

হা আমি পেয়েছি। আমি হারাম সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করার কারণে অসংখ্য কিতাব আর গভীর, প্রসস্থ এবং সুক্ষ এলম পেয়েছি। আলেমদের সোহবত পেয়েছি। ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় জেনেছি। শক্তিশালী ঈমান পেয়েছি। আর বিপর্যস্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে এমন দুটি সন্তান পেয়েছি, যারা অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে হাজার গুন্ ভালো আলহামদুলিল্লাহ। যদিও ওই বিয়েটা আমার দাদার বাড়ির মানুষেরাও মেনে নেয়নি। বাচ্চাদের নিয়েও অনেক পেরেশানিতে পড়েছি। টিকা নিয়েও অনেক ঝামেলায় পড়েছি।

আচ্ছা টিকার ব্যাপারে কিছু কথা না বললেই নয়। আমি তো ভালো করেই জানি যে, আমাদের দেশে বাচ্চাদেরকে যেসব টিকা দেয়া হয় তা মোটেও তাদের উপকারের জন্য নয়। বরং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির জন্য। টিকা গুলো স্লো পয়জনিং এর মতো। ধীরে ধীরে মানুষকে অসুস্থ করে ফেলে। টিকার কারণে বাচ্চারা উগ্র এবং বুদ্ধিহীন হয়ে যায়। তাই আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, ওদেরকে একটা টিকাও দিবোনা। ফলে চারপাশ (পরিবার,

আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী) থেকে আমার উপর চাপ আসা শুরু হয়েছে। আমি বাচ্চাদেরকে মেরে ফেলতে চাই, পঙ্গু বানিয়ে ফেলতে চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। টিকা না দেয়ার ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিলাম। কারো কোনো কথাই শুনলাম না। নিসাকেও সব বুঝিয়ে বললাম। আল্লাহর ইচ্ছায় ওদেরকে টিকা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি। পরে অবশ্য বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিতে গিয়ে মাঝে মাঝে টিকা কার্ড না থাকায় কিছুটা মুসিবতে পড়েছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন। আবার জন্ম সনদ বানাতে গিয়েও টিকা কার্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখে, বাধ্য হয়ে দুইটা নকল টিকা কার্ড বানিয়ে নিলাম। অর্থাৎ বাচ্চাদের ব্যাপারে সবকিছুতেই আল্লাহর সাহায্য পেলাম। আর ওদের বড় কোনো রোগের কারণেও আমাকে মুসিবতে পড়তে হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ।

তখন আমি আরো ভালো করে বুঝতে পারলাম যে, বাচ্চা দুটো সত্যিই আমাদের জন্য রহমত ও বরকত। কিন্তু আমরা দুইজন আলিফ আর মিমের সঠিকভাবে যত্ন নিতে পারছিলামনা। আমি তো সারাদিন অফিসেই থাকি। নিসা একা দুইজনকে সামলাতে পারেনা। না পারাটাই স্বাভাবিক। অন্যান্যরা ৪/৫ জন মিলেও একটা বাচ্চাকে সামলাতে পারেনা। সেখানে নিসা সম্পূর্ণ একা দুইজনকে কিভাবে সামলাবে?? আবার ঘরের বিভিন্ন কাজ তো আছেই। রান্না, ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ গুলোও তো নিসাকেই করতে হয়। তারপরেও নিসা সবদিক সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে নিসার জন্য খুব খারাপ লাগে। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে এমন ভাবে সবদিক থেকে আটকে ফেলেছে যে, অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও করতে পারিনা। তবুও মাঝে মাঝে নিসাকে কিছুটা প্রশান্তি দেয়ার জন্য বাহিরে ঘুরতে নিয়ে যাই। একটু ফুসকা খাওয়াই। আমার আর্থিক দিক চিন্তা করে নিসা খুব বেশি কিছু খেতেও চাইতোনা। শুধু ফুসকা, বেলপুরী আর সমুচা।

নিসার এই সাদমাটা জিন্দেগী আর বাচ্চাদের ব্যাপার গুলো চিন্তা করে আমি মনে কিছুটা প্রশান্তি পাচ্ছি। এখন আমাদের জীবন কিছুটা ভালোর দিকে। মোটামুটি অনেক কিছুই অনুকূলে চলে এসেছে।

একটা বুয়া রেখে দিছি। যেন নিসার ঘরোয়া কাজের চাপ কমে। আর বাসা থেকে অনেকগুলো কিতাব নিয়ে এসেছি, যেন কিতাবের সংস্পর্শে থেকে ঈমান, আমল ও ইলমকে আবার তাজা করতে পারি।

কিছু প্রয়োজনীয় কিতাব আনতে পেরে খুব ভালো লাগছে। অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করছে।

ফেতনা থেকে বাঁচার চেষ্টাই যখন ফেতনার কারণ:

অফিস থেকে ফিরে একটু সময় পেলেই কিতাব নিয়ে বসি। ছাত্র থাকা অবস্থায় এতো কিতাব পড়েছি যে তার ছাপ এখনো আমার অন্তরে রয়ে গেছে। তাই এখন কিতাব হাতে নিয়ে সব মনে পরে যাচ্ছে। মাঝখানে যদিও কিছুটা গাফেল হয়ে গেছি। কিন্তু ফেতনার সাগরে হারিয়ে যাইনি, আলহামদুলিল্লাহ। ফেতনা এবং হারাম থেকে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন যেহেতু আমি বাবা মা থেকে আলাদা থাকি, তাই আমার পরিবারের উপর শুধুই আমার কর্তৃত্ব। আমি এবার আমার আহালকে আমার মন মতো সাজানোর দিকে পুনরায় মনোযোগ দিলাম। যেদিন থেকে আমি দ্বীনের বুঝ পেয়েছি সেদিন থেকেই ফেতনা পূর্ণ জায়গা বা অনুষ্ঠান গুলোতে যাতায়াত একদম বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বৌ বাচ্চাকেও কঠোর ভাবে এগুলো থেকে দূরে রাখি। এতে আত্মীয় স্বজন যতই বকা ঝকা করুক আর মন খারাপ করুক না কেন, কোনো পাত্তা দেই না। কারণ আমি তো জানি এটা ফেতনার জমানা। ফেতনা থেকে বাঁচাটা অনেক কঠিন। অধিকাংশ মানুষই ফেতনায় লিপ্ত। ফেৎনাকে তারা চিনে না বা বুঝে না। সুতরাং খুব সাবধানে থাকতে হবে। শয়তান চারদিকে ফেতনার জাল বিছিয়ে রেখেছে। তাই প্রত্যেকটা পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফেলতে হবে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও পরিবারকে বেছে বেছে চলার নির্দেশ দিলাম। মোটকথা ফেতনা থেকে বাঁচতে যা যা করা দরকার সব উদ্যোগ নিলাম। কিন্তু শয়তান তো আর বসে নেই। শয়তান এবার নিসাকে টার্গেট বানালো। নিসা আমার এসব প্রচেষ্টার সাথে কিছুদিন মানিয়ে চললেও, কয়েক মাস পর ওর ভিতরে পরিবর্তন দেখতে পেলাম। ওর আচরণে বুঝতে পারলাম, আমি যে ধরণের জীবন চাচ্ছি ও সেভাবে চলতে পারবেনা। এতো দিন আমার ভয়ে ভয়ে করেছে। যদিও মুখে সরাসরি কিছু বলেনা। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, এগুলো ওর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। ও নিজেকে বন্দি মনে

করছে। কোথাও যেতে দেইনা, কারো সাথে মিশতে দেই না। নিজেও কোথাও বেড়াতে নেইনা। মজার মজার খাবার (আইসক্রিম, চকলেট, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি) খাওয়াই না। সব কিছুতেই ফেতনার কথা বলে ওকে আনন্দ করা থেকে বঞ্চিত করি। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ওকে আমি বুঝিয়ে বলি, দেখো নিসা, আমি তোমাকে বঞ্চিত করছিনা। বরং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। আমি তোমাকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবো বলো? যেখানেই যাবো, ফেতনা আর ফেতনা। হয় গান চলবে। নয়তো ছেলেমেয়ের অবৈধ প্রেম চলবে। এসব জায়গায় তো রহমত থাকেনা। বরং যে কোনো সময় আজাব চলে আসতে পারে। তখন তো ওই আজবে আমরাও গ্রেফতার হবো। আবার তোমাকে আইসক্রিম, চিপস, চকলেট, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি খাওয়াতে পারছিনা, কারণ এগুলোতে এমন কিছু উপাদান দেয়া থাকে যা মুত্তাকীদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আবার শরীরের জন্যও বিপদজনক। তোমাকে কোথাও যেতে নিষেধ করেছি, কারণ বেশিরভাগ মহিলাই পথভ্রষ্ট। দ্বীনের বুঝ নেই। তাদের সাথে সময় দিলে, তোমার দ্বীনও ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বীনদার মহিলাদের বাসায় যাও, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দ্বীনহীনদের কাছে যেও না। ঈমানকে তো আগে বাঁচাতে হবে, নাকি?

আমার কথাগুলো ওর উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। কিছুদিন ও আমার মন মতোই চললো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ও মন থেকে এসব মেনে নিতে পারছেনা। ও অবশ্যই দ্বীনদার এবং কঠোর পর্দাশীল। কিন্তু এতটা বাধ্যবাধকতার সাথে এডজাস্ট করতে পারছেনা। আসলে আমি যেভাবে সবকিছু হুট্ করে ছেড়ে দিছি, সেভাবে ও পারছেনা। না পারারই কথা। কারণ ফেতনার সমাজে থেকে ফেতনা থেকে পরিপূর্ণ রূপে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আমার ঈমানী শক্তি আর ওরটা এক নয়। এবং ফেতনা সম্পর্কে আমার মতো এলমও ওর নেই। তবুও আমি, আমার মতো

ওকে বানানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু হচ্ছেনা। ফলে ওর সাথে আবার আমার মনোমালিন্য শুরু হয়। কয়েকবার চেষ্টা করেছি। খুব একটা লাভ হয়না। উল্টো নিজেদের মধ্যেই ফেতনা শুরু হয়ে যায়। তুমুল ঝগড়া ঝাটির সাথে, কান্নাকাটি ইত্যাদি। ও মনে করে, আমি ওকে বঞ্চিত করছি। বন্দি করে ফেলেছি। মানসিক ভাবে কষ্ট দিচ্ছি। ওর প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে আবারো আমি বুঝানোর চেষ্টা করি। দেখো, ভালোবাসা তো ওটাই, যেটাতে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানোর ফিকির থাকে।

তুমি যা চাচ্ছ, তা দিয়ে দেয়ার নাম ভালোবাসা নয়। তোমার বাচ্চা ছুরির চাকচিক্য দেখে ধরতে চাইবে, ওটা দিয়ে খেলতে চাইবে। তাই বলে কি বাচ্চার হাতে ছুরি দিয়ে দিবে? ছুরি না পেয়ে কান্নাকাটিও করবে। তবুও তো তুমি ওর হাতে ছুরি দিবা না। তাই না? কারণ তুমি জানো যে, এটা দিয়ে তোমার বাচ্চার হাত কেটে যেতে পারে। কিন্তু বাচ্চাটা তো আর এটা জানে না। বাচ্চা তোমার এই আচরণে হয়তো তোমার উপর রাগ হবে। ভাববে, আম্মুর কাছে কিছু চাইলে পাইনা। আমাকে একটু খেলতে দেয়না। ঠিক একই ব্যাপারটা এখন তোমার আর আমার ক্ষেত্রে ঘটছে। আমি জানি, কোনটা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর আর কোনটা উপকারী। তাই আমি তোমাকে সেভাবেই লালন পালন করতে চাই। যদিও তোমার কাছে এটা বন্দিত্ব মনে হচ্ছে। তুমি আমার উপর রাগ হচ্ছ। অথচ আমি এগুলো তোমার ভালোর জন্যই করছি। তোমার চাওয়া পূরণের দ্বারা তুমি হয়তো কিছু সময়ের জন্য আনন্দ পাবা, কিন্তু ঈমানকে হারানোর সম্ভাবনা আছে।

আমি যখন নিসাকে এসব বুঝাই তখন বুঝে কিন্তু কিছুদিন পর আবার আগের মতো হয়ে যায়। আমিও ক্লান্ত হয়ে যাই। হতাশ হয়ে যাই। কারণ এগুলো মেইনটেইন করতে গিয়ে ঘরে খুব অশান্তি হচ্ছে। তাই আমি ওকে ওর মতো ছেড়ে দেই। যা চায় তাই

দেই। যেখানে যেতে চায়, সেখানেই নিয়ে যাই। এবার ও মনে করছে, আমি ওকে ভালোবাসা শুরু করেছি। এবার ও খুব খুশি। আমি মনে কষ্ট নিয়ে ভাবি, হায়রে ফেতনার জমানা। জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টাটা ভালোবাসা ছিল না। জাহান্নামের দিকে ছেড়ে দেয়াটা ভালোবাসা?? মনে পড়ে যায়, আল্লাহর রাসূলের কয়েকটি কথা। দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা হবে বেশি। তারা দাজ্জালি সংস্কৃতি গুলোকে খুব আপন করে নিবে। দাজ্জালের পিছে ছুটবে। আর তাই তো আল্লাহর রাসূল মেয়েদেরকে ঘরে আটকিয়ে রাখতে বলেছেন। আমি তো চেষ্টা করলাম। অনেক চেষ্টা। কিন্তু পারলাম না।

না পারলেও একদম ছেড়ে দিতে তো পারবোনা। কারণ আমার আহালকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো আমারই। তাই হাল একেবারে ছেড়ে দেই না। জানি, এই ফেতনায় পরিপূর্ণ সমাজে থেকে পূর্ণ দ্বীনের উপর চলা খুব কঠিন। আলাদা থেকেও হচ্ছে না। আত্মীয় স্বজন যখন বাসায় আসে হাবিজাবি খাবার তো নিয়েই আসে। বাচ্চাদেরকে সামলানো যায়না। আবার সবার কাছেই থাকে মোবাইল। অন্যান্য বাচ্চারা সারাদিন কার্টুন দেখে। আমার বাচ্চারাও তো বাচ্চা। এমন অবস্থায় ওদেরকে তো সামলানো যায়না। তবুও সাধ্যমতো ঈমানের উপর টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হয় দূরে কোথাও হিজরত করি। যেখানে কোনো ফেতনা নেই। ঈমান বাঁচাতে হলে ফেতনার সমাজে থেকে বাঁচানো সম্ভব না। হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী পাহাড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সেটাও তো সম্ভব নয়। বাস্তবতা তো বড়োই কঠিন। চাইলেই তো আর হিজরত করা যায়না। সমাজেই থাকতে হবে। পরিবারের সাথেই থাকতে হবে। কিন্তু এভাবে ঠেলাঠেলি করে আর কত? ফলে আমিও কিছুটা গাফেল হয়ে যাই। চেষ্টা করতে থাকি ভারসম্য বজায় রাখার। এভাবেই ভাড়া বাসায় ভালো মন্দ মিলিয়ে দুই বছর কাটিয়ে দেই।

পুরোনো বাড়িতে প্রত্যাবর্তন:

তারপর আবার আমাদের নিজেদের বাসায় ফিরে যাই। সম্পূর্ণ আলাদা দুটো রুম, একটি টয়লেট আর একটি রান্নাঘর নিয়ে নিজেদের বাড়িতে থাকা শুরু করি।

একই বাড়ি, কিন্তু সবকিছু ভিন্ন। আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে বাবার বাড়ির একপাশের অংশ নিজের থাকার উপযুক্ত বানিয়ে নেই। আমরা ফিরে আসাতে আব্বু খুব খুশি। কারণ তিনি তার নাতিদেরকে পেয়েছেন। আর আম্মু খুশি, কারণ তিনি আমাকে পেয়েছেন। আম্মু আমাকে খুবই ভালোবাসে। আমাকে না দেখে থাকতেই পারে না। তাই আমিও ভাড়া থাকা অবস্থায় প্রায়ই আম্মুর সাথে এসে দেখা করে যেতাম। নিশাও আমাকে খুব ভালোবাসে। স্বামীর খেদমতের দিক থেকে ও ছিল সেরা।

আমার আনুগত্য আর বাধ্য থাকার ব্যাপারেও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু পারিপার্শিক অবস্থা আর ফেতনায় পরিপূর্ণ এই বিষাক্ত সমাজের প্রভাবে নিসা অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এগুলোর প্রভাব আমার বাচ্চাদের উপরেও পড়ছে। এই বাড়িতে আগে যখন ছিলাম, তখন আব্বু আম্মুর উপর দাওয়াতী কাজ চালিয়েছিলাম। বাসায় তালিম করতাম। ইসলামের ব্যাপারে বিস্তারিত বুঝাতাম। এতে খুব একটা কাজ হয়নি। উল্টো ফেতনার সৃষ্টি হতো।

আব্বুর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার তর্ক হতো। কারণ তিনি গতানুগতিক মডারেট ইসলামকেই আসল ইসলাম মনে করতেন। আমি যদি ইসলামের কোনো বিশেষ হুকুমের কথা শুনাতাম, তখন আব্বু রাগ হয়ে বলতো: "তুই কি হুজুরদের চেয়ে বেশি

বুঝোস"? এসব বাড়াবাড়ি বাদ দিয়ে শুধু ৫ ওয়াক্ত নামাজ পর"। ইত্যাদি ইত্যাদি। আম্মু প্রথম প্রথম আমার কথা গুলো শুনতো এবং মানত। কিন্তু এখন আবার আগের মতো হয়ে গেছে। মহিলারা সাধারণত স্বামীর দীনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। আব্বুর সাথে থাকতে থাকতে আম্মুর একদম প্রাথমিক অবস্থার ঈমানী নূর বা তাকওয়া তো অনেক আগেই গেছে। এখন সাধারণ বুঝ টুকুও নাই।

তাই এখন আর তাদেরকে দাওয়াত দিতে যাইনা। কারণ এতে আরো ফেতনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের পরিবর্তনের জন্য দোয়াকে অব্যাহত রাখি।

অফিসের ফেতনা:

বিয়ে এবং জবের আগে আমি সারাদিন কিতাব নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। খুবই সুন্দর কাটতো দিনগুলো। কিতাব পড়তে পড়তে সাহাবীদের স্বর্ণযুগে হারিয়ে যেতাম। দুনিয়ার ফেতনা গুলো টেরই পেতাম না। দুনিয়ার বুকে জান্নাতের স্বাদ নিচ্ছিলাম। বই পড়ার অভ্যাস তো ছোটবেলা থেকেই ছিল। দ্বীনের উপর আসার পর এটা আরো মজবুত হয়েছিল। সবসময় আমার সাথে কিতাব থাকতো। কোথাও সফরে গেলেও কিতাব নিয়ে যেতাম। একটু সুযোগ পেলেই এক পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম। এমন কি পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময়ও বাসে দ্বীনি কিতাব পড়তাম। একটা সাধারণ বাটন মোবাইল ছাড়া আর কিছুই ছিলোনা। জরুরি প্রয়োজনে শুধু কথা বলতাম। ফেতনার জগৎ থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা তো আর এভাবে বেশিদিন থাকতে দিবে না। দেয়ও নি। রিজিকের সন্ধান করতে গিয়ে কত ফেতনায় পড়তে হয়েছে। এখনো হচ্ছে। এখন তো দামি কোম্পানিতে জব করি। ফেতনার অভাব নেই। অফিসে যাওয়ার সময় মেইন রোডে (মহাসড়ক) উঠা থেকেই ফেতনা শুরু হয়।

অসংখ বেপর্দা নারী। না চাইলেও চোখে পরে যায়। এতোদিনতো এলাকার ভিতরেই একটা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ছিলাম। তাই এই ফেতনাগুলো থেকে নিরাপদ ছিলাম। ওখানে যদি ভালো রিজিকের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে ওখানেই থেকে যেতাম। কিন্তু বৌ ও দুই বাচ্চা নিয়ে পোষায়না। তাছাড়া সেখানে মালিকদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে দুইভাগ হয়ে গিয়েছিলো। তাই বাধ্য হয়েই কর্পোরেট জগতে ঢুকতে হয়েছে। রাস্তায় বেপর্দা নারী তো থেকেই সাথে আরো কত ফেতনা। ভাড়া নিয়ে প্রতিদিন যাত্রীর সাথে ড্রাইভার আর হেল্পারের গন্ডগোল, হৈচৈ ইত্যাদি। ৫/১০ টাকার জন্য মারামারিও শুরু হয়ে যায়। পুলিশের সাথে ড্রাইভারদের ঝামেলা। আর লম্বা জ্যাম তো আছেই। এখানে

সেখানে ময়লা পড়ে আছে। সেগুলো থেকে ভয়াবহ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে আছে। অনেক গাড়ি ফেঁসে যাচ্ছে। মানুষ যে যার মতো রাস্তা পার হচ্ছে। কোনো নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা কারো মধ্যেই নেই। পকেট মেরে নিচ্ছে। রাতে ছিনতাই হচ্ছে।

প্রতিদিন অফিসে আসা যাওয়ার পথে এগুলোর সম্মুখীন হতে হয়। যদিও এগুলো আমাদের দেশের খুব কমন চিত্র। সবাই অভস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যেহেতু দীর্ঘদিন এসব থেকে সম্পূর্ণ দূরে এবং কিতাবের জগতে ছিলাম, তাই এগুলো আমার কাছে খুব ফেতনা মনে হচ্ছে। মেনে নিতে পারছিনা। ইসলামী সমাজের সাথে মিলাতে পারছিনা। প্রকৃত মুমিন খুঁজে পাচ্ছিনা। আবার অফিসের কিছু নিয়ম কানুনের সাথেও মন বসাতে পারছিনা। কিছু ফেতনায় জড়াতেই হবে। যেমন স্মার্ট ফোন নিতে হবে। ই-মেইল সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কন্টিনিউ থাকতে হবে। স্যালারি হবে ব্যাংকে, তাই ডেবিট কার্ড নিতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কর্পোরেট কিছু রুলস মানতেই হবে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তারপর ধীরে ধীরে সয়ে যায়। কিন্তু যেগুলোর মধ্যে সরাসরি সুদের সম্পৃক্তা বা অন্য কোনো হারামের সংমিশ্রণ আছে, সেগুলো থেকে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করলেন। এখানে উদযাপিত বিভিন্ন অপসংস্কৃতি থেকেও নিজেকে দূরে রাখলাম।

কিন্তু এগুলো এতো সহজে পাইনি। যথেষ্ট মেহেনত করতে হয়েছে। বসদের সাথে এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্কও করতে হয়েছে। অনেকেই আমার উপর ক্ষুন্ন হয়েছে।

তবুও আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। যেদিন কোনো অনৈসলামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেদিন আমি ছুটি নিয়ে নেই। এমনকি কারো কোনো ঘরোয়া

পোগ্রামেও অংশগ্রহণ করিনা। হোক সে আমার নিজের বস, বা হোক সে এখানের প্রধান ইনচার্জ।

প্রথম প্রথম আমার এসব কর্মকান্ডকে সবাই বাড়াবাড়ি মনে করতো। পরে যখন আমি তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা শুরু করি, তখন তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করে। তারা নিজেরা এসব থেকে দূরে থাকতে না পারলেও আমাকে সমর্থন করে এবং এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এখন আর আমাকে কেউ ভুল বুঝেনা।

এখন অফিসের পরিবেশ মোটামুটি আমার অনুকূলে আছে।

এখানে কখনোই জামাতে নামাজ হয়নি। আমার ইমামতিতে অফিসের ফ্লোরে জামাতের সাথে প্রথমবারের মতো নামাজ আদায় হয়েছে। পরবর্তীতে আমার ও আরেক বসের প্রচেষ্টায় নামাজের জন্য আমরা বড় একটি রুম পাই। এবং আমার দাওয়াতে র প্রভাবে ধীরে ধীরে অনেকেই নামাজী হয়ে উঠে, আলহামদুলিল্লাহ। কেউ কেউ দাড়িও রেখে দেয়। আমি অফিসে থাকা কালীন কেউ গান শুনেনা বা ফালতু আলোচনা করেনা। কাউকে এমন করতে দেখলেই আমি সাবধান করে দেই। এবং ইসলামী আলোচনা করার বা শুনার অনুরোধ করি।

এতো কিছুর পরেও, কিছু ফেতনা তো থেকেই যায়। যা দূর করা কখনোই সম্ভব নয়। একজন মুমিনের জন্য এগুলো ভালো না লাগাটাই স্বাভাবিক। আমার ও লাগেনা। তাই সবসময়ই দোআ করতে থাকি, "হে আল্লাহ আপনি আমাকে অন্য কোনো সহজ, উত্তম ও প্রসস্থ রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন"।

অফিস যখন গবেষণাগার:

সারাদিন কম্পিউটারে কাজ করতে হয়। নেট তো আছেই। আর কিতাব পড়ার অভ্যাস তো যায়নি। তাই নেটেই পিডিএফ পড়া শুরু করলাম। যখনি অবসর পাই, তখনি কিতাব পড়ি।

মাঝে মাঝে কিছু ডকুমেন্টারিও দেখি। অফিসের প্রয়োজনে একটা স্মার্ট ফোন কিনতে হয়েছে। এটাকেও দ্বীনের কাজে লাগিয়ে নিয়েছি। ভালো ভালো কিছু চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছি। প্রয়োজনীয় ভিডিও গুলো ডাউনলোড করে রাখি। আসা যাওয়ার পথে বাসে বসে দেখি। যেদিন সিট পাইনা, দাঁড়িয়ে যেতে হয় সেদিন আর দেখা হয়না। যেহেতু বাসায় গিয়ে কিতাব পড়ার সময় পাইনা। তাই অফিস আর গাড়িকেই এলম শিক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছি। অফিসে তো যেতেই হবে। বাসে তো উঠতেই হবে। জ্যামে তো পড়তেই হবে। তাই বাস্তবতাকেও মেনে নিতেই হবে। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য এবং মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার জন্য সবকিছুকে নিজের অনুকূলে বানিয়ে নিলাম। তাই এখন আর খুব একটা কষ্ট হয়না। মনকে বুঝাই আমি তো অফিসে যাচ্ছি এলম অর্জনের জন্য। যদিও রিজিক অন্বেষণের একটা নেকী তো আমি পাচ্ছিই। তবুও এলম চর্চার কথা ভাবতেই বেশি ভালো লাগে।

তবে হা, এলম চর্চা করতে গিয়ে কাজের কোনো গাফলতি করিনা। আগে কাজ শেষ করি। তারপর এলম চর্চা করি। অনলাইনের পড়াশুনাটা আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে। কারণ একটা জিনিস পড়তে গিয়ে বাড়তি কিছু জানার প্রয়োজন পড়লে সাথে সাথে তা নেটে সার্চ দিতে পারি। ভিডিও বা আর্টিকেল কিছু একটা পেয়েই যাই। ফলে আমার পড়াশুনাটা আরো ইফেক্টিভ হয়।

শেষ জমানা নিয়ে জানার আগ্রহটা আমার তো সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে, যেদিন "ইমাম মাহদীর আগমন" কিতাবটা পড়েছিলাম। এর পর থেকেই ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, ঈসা (আ:), ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করলাম। এখন অনলাইনে (দেশি বিদেশী ওয়েবসাইট) সেগুলো নিয়ে আরো বেশি ঘাটাঘাটি করি। এসব জিনিস নিয়ে ঘাটতে ঘাটতে বিভিন্ন রকম সিক্রেট সোসাইটির কথা জানতে পারলাম। যারা কিনা দাজ্জালের আর্মি হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ দাজ্জালের আসার পথকে পরিষ্কার করছে। এগুলো নিয়ে যতই ঘাটাঘাটি করছি, ততই আশ্চর্য তথ্য পাচ্ছি। আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। কি ভয়ংকর ভাবে ফেতনার জালকে চারদিকে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। গবেষণার সাথে যখন বাস্তবতাকে মিলাচ্ছি, তখন ভয়ে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে এটাই তো সেই সময় যখন ঈমানকে হাতে রাখাটা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মতো হবে।

আর আমি নিজেও তো ভুক্তভোগী। বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত। বার বার ভেঙে পড়ে পিছিয়ে যেতে চাই, আর বার বার আল্লাহ আমাকে দয়া করে ফিরিয়ে আনেন। নিজের সাংসারিক জীবনের পেরেশানীগুলোর দ্বারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে দাজ্জালের ফেতনা কি জিনিস।

মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে, আল্লাহ আমাকে ছেড়ে দেন নি। নয়তো শয়তান আমাকে ফেতনার জালে ফেলে কবেই পথভ্রষ্ট করে দিতো। এখন আল্লাহর ইচ্ছায় নিজের অফিসের পিসিটাকে ছোটোখাটো একটা গবেষণাগার বানিয়ে ফেলেছি। এই গবেষণা গুলোই আমার অন্তরে প্রশান্তি দেয়। আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, আলহামদুলিল্লাহ।

পুনরায় গন্ডগোল:

যেই গন্ডগোলের কারণে আমাকে সপরিবারে নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল, সেই গন্ডগোল আবার শুরু হয়েছে। অর্থাৎ বৌ শাশুড়ির ঝামেলা।

শত চেষ্টা করেও, আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারছিনা। আব্বুও বিরক্ত হয়ে গেছে। বলতে গেলে প্রতিদিনই কোনো কোনো ঝামেলা হতোই। একদমই ছোট্ট কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে করতে ব্যাপক আকার ধারণ করতো। সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে দেখি এই অবস্থা। বেশিরভাগ সময় সবর করি। আবার মাঝে মাঝে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমাকেও তখন উচ্চবাচ্চ করতে হয়। তবে মায়ের হকের ব্যাপারে, অর্থাৎ তার সাথে যেন বেয়াদবি হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতই ঝামেলা হোক না কেন। বাড়ি ছাড়বো না। যেভাবেই হোক, এখানে থেকেই সমস্যার সমাধান করবো। কারণ আলাদা থেকেও শান্তি পাইনি, বা সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং শুধু শুধু বাসা ভাড়া বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে।

আম্মুর ব্যাপারগুলো ভালো করে খেয়াল করলে এবং তা বিশ্লেষণ করলে যে কেউই ধরতে পারবে যে, এখানে অন্য কোনো সমস্যা আছে। আর যারা ইসলামিক মাইন্ডেড তারা তো স্পষ্টই বুঝতে পারবে যে, এটা জীন বা কালো জাদুর প্রভাব। এই বিষয়গুলো আমি আবার আব্বুকে বুঝাই। এবার আব্বু রাজি হয়। তিনি একজন আলেমকে দিয়ে পুরো বাড়ি বন্ধ (চারদিকে কোরানিক আমলের দ্বারা জীন শয়তানের কু-প্রভাব থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা) করেন। এতে কিছুদিনের জন্য আমাদের পরিবারে শান্তি নেমে আসে, আলহামদুলিল্লাহ। পরে আবার আগের মতো শুরু হয়ে যায়। এভাবে আবার গন্ডগোলের মধ্যে দিয়েই অনেকদিন পার হয়। কিন্তু অবস্থা যখন একদমই সহ্যের বাহিরে চলে যায়, তখন আমরা একজন ভালো ও অভিজ্ঞ রাকির দ্বারা অনেক টাকা

খরচ করে সবাই চিকিৎসা নেই। আম্মু তো রাকির কাছে যেতেই চায় না। আর কোনো ভাবে যদি নিতে পারিও, রাকির দেয়া পানি পড়া বা আমল গুলো ঠিক মতো করতে চায়না। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আম্মুর সাথে থাকা জিনটাই আম্মুকে আমল করতে দেয়না। তাই আমি নিজেই আম্মুকে পড়া পানি খাইয়ে দেই। গোসলের পানি এগিয়ে দেই। যথা সময়ে আমলের কথা মনে করিয়ে দেই।

এতে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা কাজ হয়। আম্মু অনেক শান্ত হয়ে যায়। রাকি সাহেব আমার আর নিসার সম্পর্ক উন্নতি হওয়ার আমল দিয়েছেন। কারণ আমি তাকে বলেছিলাম, "হজরত, আমাদের পাশের জাদুকর লোকটি হয়তো আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট করারও জাদু করেছে"।

উনার দেয়া আমলের প্রভাবে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি হতে লাগলো, আলহামদুলিল্লাহ। রাকি সাহেব আমাদের বাসায় এসেছিলেন। তিনি পারিপার্শিক অবস্থা পরীক্ষা করে, তার বিশেষ আমলের দ্বারা বুঝেছিলেন যে, আমাদের পুরো পরিবারে উপরই কালো জাদু করা আছে। তাই তিনি আমাদের সবার জন্যই আমল ও পানি পড়া দিয়েছেন।

এই সবকিছুর বরকতে আমরা এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটাই ভালো আছি। তবে অনেক গুলো বছর যে যন্ত্রনা পেয়েছি, তা বুঝানো সম্ভব নয়। আল্লাহ যদি আমাকে সবর শক্তি না দিতেন, তাহলে আমার আর নিসার সংসারটা টিকে থাকতো না। ধ্বংস হয়ে যেত আলিফ আর মিমের নিষ্পাপ জীবন।

দুনিয়াপ্রেমী বাবা বনাম দ্বীনদার ছেলে:

রুকিয়ার কারণে বৌ শাশুড়ির গন্ডগোল তো মিটেছে, কিন্তু শয়তান তো আর বসে নেই। সে এবার আব্বুর পিছনে লেগেছে। আব্বু তো এমনিতেই দুনিয়া প্রেমী। তার উপর ইসলামের ব্যাপারে কাটছাট করা মডারেট ইসলামকেই বেশি পছন্দ করে। আসলে ইসলাম বলতে বেশির মানুষই, এমন ইসলামকেই বুঝে। সাহাবী ওয়ালা ইসলামকে (প্রকৃত ইসলাম) তো ৯৯% মানুষ ভুলেই গেছে। প্রচুর পড়াশুনা আর তাকওয়া পূর্ণ জিন্দেগীর দ্বারাই আসল ইসলামকে খুঁজে পাওয়া যায়। এবং তার স্বাদ নেয়া যায়। কিন্তু সেটা তো আর সবাই পারেনা বা করেনা। দুনিয়ার সাফল্যের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ করতে রাজি আছে। আর ইসলামের ব্যাপারে সহজ ও শর্টকাট টাই খুঁজে বেড়ায়। সামান্য কষ্ট করতেও রাজিনা। বরং যা আছে সেটাকেও বাদ দেয়ার উছিলা খুঁজতে থাকে। এটাতো আমাদের সমাজের কমন চিত্র। আমার বাবাও এরকমই একজন। তাই আব্বুর সাথে আমার মানসিকতা না মিলাটাই খুব স্বাভাবিক।

এলাকায় বা আত্মীয় স্বজনের বাসায় যদি কোনো পোগ্রামের আয়োজন করা হয়, সেখানে যাওয়ার জন্য আব্বু আমাদের ৪ জনকে (আমার পরিবার) জোড়াজুড়ি করতে থাকে। আমি তো ভালো করেই জানি যে সেখানে কি হবে?? গান আর পর্দাহীনতায় ভরপুর থাকবে। যদিও এটাই তাদের কাছে ট্রেন্ড। সুতরাং যাবোনা বলেই জানিয়ে দেই। এতেই শুরু হয় আব্বুর লেকচার। অসামাজিক, অসভ্য কোথাকার? সামাজিকতা বুঝোস না। মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারোস না। মৌলবাদী হয়ে গেছস?? ইসলাম কি আত্মীয় স্বজনের অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছে?? সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছে?? নতুন হুজুর আসছস তুই? হুজুররা যায়না? অমুক ইমাম সাহেবও তো বিয়েতে আসে। তুই কোথায় পাইসোস এইসব ইসলাম?? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদিও আমি এসকল অনুষ্ঠানের সমস্যা গুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলি, কিন্তু তাতে সামান্যতমও লাভ হয়না। হবেই বা কিভাবে? একে তো প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানে না তার উপরে রেফারেন্স হিসাবে ইমাম সাহেবের বিয়েতে আসাটা তো আছেই। আমার কথার আর কি মূল্য? আমি তো আলেম বা ইমাম নোই। এভাবেই প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় আমার সাথে আব্বুর মনোমালিন্য হয়।

এরপর শুরু হয় নিসাকে নিয়ে। বাসায় হয়তো এমন আত্মীয় আসছে, যাদের সাথে নিসার পর্দা করতে হবে। সুতরাং নিসা তাদের সামনে যাবেনা, এটাই স্বাভাবিক। ব্যাস, এটা নিয়েও শুরু হয়ে যায়। সেই পুরোনো লেকচার। আমরা তালেবান হয়ে গেছি। মৌলবাদী হয়ে গেছি। আত্মীয়র সাথে দেখা করিনা। স্বার্থপর হয়ে গেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার আমি আব্বুকে পর্দার ব্যাপারে বুঝাই। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়না। কারণ তারা তো পর্দা বলতে বাহিরে যাওয়ার সময় কোনো রকম বোরকা পড়াটাই বুঝে। এরকম মাহরাম, গায়রে মাহরাম মেনে চলাটা তো বুঝেনা।

বেশিরভাগ সময় আমার আর নিসার সাথে আব্বুর এই দুটি বিষয় নিয়েই গন্ডগোল হয়। কোথাও যাওয়া আর পর্দা নিয়ে।

এতো গেলো আমি আর নিসা। আমার বাচ্চারা অর্থাৎ আলিফ আর মিমও তো ফেতনা থেকে রেহাই পায়না। আলিফকে কেন এতো ছোট বয়সে পায়জামা, পাঞ্জাবি ও টুপি পড়াই? মিমকে কেন এখনই হিজাব পড়াই। ওদেরকে কেন মাদ্রাসায় দিবো? মেলা বা অন্য কোনো (ফেতনা পূর্ণ) স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাইনা কেন? চকলেট, চিপস, আইসক্রিম কেন খেতে দেইনা?? মোবাইলে ভিডিও বা কার্টুন কেন দেখতে দেইনা?? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা না দিলেও তারা ঠিকই আদরের নাম দিয়ে কাছে নিয়ে চকলেট, চিপস, জুস্ খাইয়ে দেয়। টিভিতে কার্টুন ছেড়ে দেয়। গরম লাগবে বলে আলিফের টুপি খুলে দেয়। মিমের হিজাব খুলে দেয়।

আমার বাসায় টিভি নেই। কিন্তু আব্বুর বাসায় আছে। আর নাতিরা তো ওখানে যাবেই। এটা তো ঠেকানো সম্ভব নয়। তাও আমি এসব নিয়ে হৈচৈ করি। যেনো বাচ্চাদেরকে টিভি দেখতে না দেয়। ওরা বাসায় গেলে টিভি যেন অনই না করে। তবুও আব্বু আম্মু ঠিকই লুকিয়ে ওদেরকে কার্টুন দেখতে দেয়। তাই আমি টিভিটা ঘর থেকেই বের করার চিন্তা করি। বহু চেষ্টা করে ওখান থেকে টিভিটাকে বের করতে সফল হই। কিন্তু তাতেও লাভ হয়না। টিভির জায়গায় চলে এসেছে স্মার্ট ফোন। আব্বু আম্মু দুজনের কাছে দুটো ফোন। এবার ওরা এটাতেই দেখে। তাই আমরা আলিফ আর মিমের উপরে চাপ দিলাম। ওরা যেন ওই বাসায় খুব কম যায়। আর গেলেও যেন মোবাইলে কিছু না দেখে। আমরাই ওদেরকে কার্টুন (ইসলামিক) দেখাবো বলে আশ্বাস দেই। এতে কিছুটা কাজ হয়।

আমরা বাচ্চাদেরকে ওখানে কম যেতে দেই বলে, আব্বু আম্মু আমাদের উপর খুব রাগ হয়। তারা মনে করে আমরা তাদের নাতিদেরকে দাদা দাদুর আদর থেকে বঞ্চিত করছি।

আদর করতে গিয়ে যে ওদেরকে ফেতনা ও অনৈসলামিক জিনিস শিখাচ্ছে সেটা তো আর তারা বুঝেনা।

মাদ্রাসা নাকি স্কুল:

আলিফ আর মিমকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানোর সময় হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে নতুন ফেতনা।

আমার নানাও আমাকে মাদ্রাসায় দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু আব্বু দেয়নি। এখন আমি আলিফ আর মিমকে মাদ্রাসায় দিতে চাই। কিন্তু আব্বু বাধা দিচ্ছে। তার ধারণা মাদ্রাসায় পড়লে টেনে হিচড়ে দয়ার জীবন যাপন করতে হয়। আর বেশিরভাগ ছেলেপেলেই নাকি নষ্ট হয়ে যায়। আমি আব্বুকে বুঝাই যে তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তারা মোটেও দয়ার জীবন যাপন করেনা। বরং অতি সম্মানের জিন্দেগী পার করে। তাদেরকে মানুষ ভালোবাসে। আল্লাহ তায়ালা মাদ্রাসার বাচ্চাদের প্রতি মানুষের অন্তরে ভালোবাসা তৈরী করে দেন। তাই মানুষ ওলামা তোলাবাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে খাওয়াতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। আল্লাহ তো আর ফেরেশতাদেরকে দিয়ে আসমান থেকে খাবার পাঠাবেন না। তিনি এই দুনিয়ার মাখলুখ (মানুষ) দেরকে দিয়েই উনার পছন্দের বান্দাদের (কোরানের ছাত্র) কাছে রিজিক পাঠাবেন। এটা হয়তো তোমার (আব্বু) কাছে দয়া মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ মাদ্রাসার জন্য অভাবনীয় স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন। ওলামা তোলাবারা আমাদের চেয়ে ভালো খানা খায়। মানুষ তাদেরকে দাওয়াত খাইয়ে শান্তি পায়।

আপাত দৃষ্টিতে তাদের ইনকাম (সংখ্যার দিক থেকে) হয়তো কম। কিন্তু তাদের ওই অল্প আয়ের ভিতরে আল্লাহ বরকত দিয়ে দেন। ঐটুকু দিয়েই তাদের জরুরত পূরণ হয়ে যায়। কারণ তারা সুন্নতি জিন্দেগী যাপন করে। ফলে বড় বড় সমস্যা গুলো থেকে মুক্ত থাকেন। অন্যদিকে দ্বীনহীন মানুষ গুলো আধুনিক জীবন যাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম রোগ ও সমস্যার মুখোমুখি হয়। সেগুলোর সমাধানের জন্য তাদেরকে

অনেক ইনকামের পিছনে জীবনকে ব্যায় করতে হয়। গাধার মতো সারা জীবন টাকার পিছনেই দৌড়ায়, কিন্তু তা ভোগ করতে পারেনা। আমরা মনে করি তারা অনেক ইনকাম করছে। আসলে তারা যা আয় করছে, তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, তারই ভুল জীবন যাপনের জন্য। কিন্তু সেটা সে বুঝেনা। আমরাও বুঝিনা। বড় একটা সংখ্যার ইনকামের কথা শুনে বিমোহিত হয়ে যাই। এটাই শয়তানের ধোঁকা। শয়তান চায় তোমার সারা জীবন যেন ইনকামের পিছনেই কেটে যাক। আখেরাতের কথা যেনো চিন্তাই করতে না পারো।

অপরদিকে দেখো, ওলামা তোলাবারা ইনকামও করছে, বৌ বাচ্চাকেও সময় দিচ্ছে, নিজের আখেরাতকেও ঘুছিয়ে নিচ্ছে।

আর তাছাড়া মাদ্রাসার ছাত্র গুলো বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র হয়। কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্ররা বেশিরভাগই উগ্র এবং বেয়াদব হয়। তারা বড় হয়ে নিজের বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনা যায়নি, কোনো আলেম তার বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়েছে। কারণ আলেমরা জানে যে, বাবা মার্ খেদমতই হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়। হা, মাদরাসায়ও খারাপ ছেলে আছে। আবার স্কুলেও ভালো ছেলে আছে। তবে গড় হিসেবে ভালোর সংখ্যাটা মাদ্রাসাতেই বেশি।

আবার আরেকটা বিষয় খেয়াল করো আব্বু, আল্লাহর অলিরা বলেন: বাংলা, ইংলিশ, অঙ্ক আকাশে বাতাসে উড়ে। চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু কোরানের জ্ঞান মেহেনত করে অর্জন করতে হয়"। ব্যাপারটা কিন্তু সত্য। এই সমাজে থাকলে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য বা রিজিক উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রাকৃতিক ভাবেই পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট ছেলে, দোকানে বসে জটিল জটিল হিসাব করে ফেলে।

অনেক অশিক্ষিত গন্ড মূর্খ লোকেরা কোটি কোটি টাকার মালিক। তাদের অধীনে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত লোকেরা গোলামী, মানে চাকুরী করে। সুতরাং বুঝা গেলো, শিক্ষা টাকা অর্জনের জন্য নয় বরং মনুষত্ব অর্জনের জন্য। শিক্ষা ছাড়াও টাকা কামানো যায়। কিন্তু মনুষত্ব অর্জন করা যায়না।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোন শিক্ষার দ্বারা মনুষত্ব অর্জিত হয়?

ফ্রিমেসনিক আর সেকুলার বাংলা ইংলিশ দিয়ে??

মোটেও না। মনুষত্ব অর্জনের সেই শিক্ষাটা হচ্ছে কুরআন হাদিসের শিক্ষা।

ইসলামের শিক্ষাই মানুষের ভিতরের পশুত্বটাকে বের করে দিয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

আর রিজিক?? সেটার মালিক তো আল্লাহ। যার জন্য যতটুকু রিজিক নির্ধারিত আছে, সে তা পাবেই। রিজিক এক জিনিস। আর শিক্ষা আরেক জিনিস। আমাদের সমাজে লক্ষ লক্ষ ছেলে আছে, যারা মাস্টার্স শেষ করেও বেকার। রিজিকের ব্যবস্থা হয়নি। আবার অনেকে আছে, যাদের কোনোই পড়াশুনাই নেই, কিন্তু ভালো রিজিকের ব্যবস্থা আছে। উচ্চ শিক্ষিত হলেই যে সে অনেক রিজিক পেয়ে যাবে ব্যাপারটা তা নয়। আবার শিক্ষা না থাকলে কোনো রিজিক পাবেনা, তাও নয়।

রিজিক আর শিক্ষা দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বর্তমানে আমাদের অন্যতম প্রধান একটি মানসিক সমস্যা হচ্ছে, আমরা শিক্ষার দ্বারা রিজিক উপার্জন করতে চাই। কিন্তু পূর্ববর্তী মানুষেরা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে সমাজকে আলোকিত বা পরিবর্তন করেছেন।

এতক্ষন চুপ করে আব্বু আমার কথা গুলো শুনেছে। অনেকটা বুঝেছে। এবার বলছে, তো মাদ্রাসায় পড়ে তো কোনো সরকারি চাকরি (গোলামী) পাবে না। বা ভালো কোনো কোম্পানির চাকরিও পাবে না। সারা জীবন ইমামতি বা মুয়াজ্জেন গিরিই করতে হবে। মানুষের দয়ায় চলতে হবে।

আমি বললাম, আমি তো তোমাকে এতক্ষন বুঝালাম যে শিক্ষা চাকুরীর জন্য নয়। ওদের রিজিকের কি ব্যবস্থা হবে সেটা তো আল্লাহই ভালো জানেন। আর সরকারি চাকরি বা কোম্পানির চাকরিই করতে হবে কেন? আর কোথাও কি রিজিক নেই??

আর হা, তুমি যে এই মাত্র বললে, ইমাম মুয়াজ্জেনরা দানের টাকায় চলে, এটা খুব বাজে কথা। চিন্তা টাকে একটু পরিবর্তন করো। তারা মোটেও দানের টাকায় চলেনা। তারা আমাদের দ্বীনি চাহিদা পূরণ করে দিচ্ছেন, আমরা তাদের দুনিয়াবী চাহিদা পূরণ করে দিচ্ছি। উনারা যদি মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করা বন্ধ করে দেন, তাহলে আমাদেরকে ইসলাম শিখাবে কে? তারা তো সারাদিন ইসলামের প্রচার প্রসারের ফিকিরে ব্যস্ত থাকেন। আমাদের আখেরাতের কথা চিন্তা করেন। তাহলে আমরা তাদের দুনিয়ার কথা চিন্তা করবো না??

এটা দয়া নয়। এটা ভারসম্য। এটা বিনিময়। এটা দেয়া নেয়া। তারা আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা তাদেরকে হাদিয়া দিচ্ছি।

নিচ্ছি, দিচ্ছি। দয়া করছিনা। তাদের প্রাপ্যই তাদেরকে দিচ্ছি।

আব্বু: সবই বুঝলাম। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়ে তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অর্থনীতিবিদ হতে পারবেনা।

আমি: স্কুলে পড়েও তো আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস বা মুফাস্সির হতে পারবেনা। আর তাছাড়া তুমি যেই পেশা বা জ্ঞানের কথা বললে, এগুলো অন্যান্য প্রাণীকুলের মধ্যেও আছে। যেমন: প্রত্যেকটা প্রাণী তাদের নিজ নিজ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। কোন সমস্যার জন্য কি খেতে হবে এবং সুস্থ হতে পারবে, সেটা তারা ভালো করেই জানে। এক্ষেত্রে বানর, মাছ, কুকুর ভালো উদাহরণ।

একবার কিছু বানরকে মারার জন্য বিষ মিশানো কিছু রুটি দেয়া হয়েছিল। তারা এসে রুটি গুলো হাতে নেয় এবং ঘ্রান নিয়ে চলে যায়। পরে, প্রত্যেকেই একটা করে পাতা সহ ডাল নিয়ে ফিরে আসে। এবং এক কামড় রুটি খায়, আরেক কামড় ডাল সহ পাতা খায়। এভাবে রুটি খেয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করে জানা যায়, বানর গুলো রুটিতে দেয়া বিষের কথা বুঝতে পেরে ওই ডাল নিয়ে এসেছিলো। আর ওই ডালে ছিল বিষ নাশক উপাদান। সুতরাং বুঝা গেলো, তাদের কাছে চিকিৎসা জ্ঞান রয়েছে।

আবার মৌমাছি ও বাবুই পাখির বাসার দিকে তাকাও। বাসার ডিজাইন ও মেজারমেন্ট দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেলো, তাদের কাছে প্রকোশলী বিদ্যা রয়েছে।

আর পিঁপড়ার জীবন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে তুমি পাবা অর্থনীতি, শৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জ্ঞান। এছাড়াও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য অন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন তার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক ভাবেই মানুষ ও পশু পাখি শিখে ফেলে। কিন্তু কুরআন হাদিসের এলম চেষ্টা মেহেনত ছাড়া অর্জন করা যায়না।

কিন্তু তাই বলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবেনা, আমি সে কথা বলছিনা। ইসলামেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আমি বুঝাতে চাচ্ছি, এগুলোকেই জীবনের লক্ষ্য বানানো ঠিক নয়। আর তাছাড়া মাদ্রাসায় পড়েও এসব লাইনে দক্ষ হওয়া সম্ভব।

অনেক রাজমিস্ত্রি আছে, যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চেয়েও দক্ষ। অনেক ইলেক্ট্রিশিয়ান আছে, যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে চেয়েও দক্ষ। অথচ তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তাহলে বুঝা গেলো চেষ্টা করলে মাদ্রাসায় পড়ার পড়েও এসব হতে পারবে। ডাক্তারও হতে পারবে। হোমিও বা আয়ুর্বেদিক চর্চা করবে। অসুবিধা কি?

দেখো আব্বু, আমাকে তো তুমি স্কুল কলেজেই পড়িয়েছো। নামি দামি প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে পড়াশুনা শেষ করিয়ে উচ্চ শিক্ষিত বানিয়েছো। কিন্তু আজ যদি আমার মধ্যে ইসলামের ছোয়া না থাকতো, আমি অমানুষ হয়ে যেতাম। গান বাজনা আর ফ্যাশন নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।

স্কুল কলেজের পড়াশুনায় কুফুরীতে ভরপুর। তাই আমি কেন এই ঝুঁকি নিবো?? এখানে তো শিখায় কিভাবে ভ্যাট ট্যাক্সের নাম সুকৌশলে মানুষের সম্পদকে চুরি করতে হয়?

কিভাবে লাভ বা ইন্টারেস্টের নামে মানুষকে সুদের জালে জড়িয়ে আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করে দেয়া যায়?

কিভাবে সহশিক্ষার নামে অবৈধ প্রেম ভালোবাসাকে উস্কে দেয়া যায়?

কিভাবে বিজ্ঞানের নামে পুরোনো জাদুচর্চাকে বাস্তবায়ন করা যায়?

কিভাবে চিকিৎসা আর টেস্টের নামে মানুষকে নিঃস্ব বানিয়ে দেয়া যায়?

কিভাবে পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্রের নামে মানুষকে শোষণ করা যায়?

কিভাবে আইনের নামে বেআইনি কাজগুলোকে বৈধতা দেয়া যায়?

কিভাবে মুক্ত চিন্তার নামে ইসলামের ভুল ধরে নাস্তিক হওয়া যায়?

কিভাবে সংস্কৃতি চর্চার নামে শয়তানি অপসংস্কৃতি পালন করা যায়?

কিভাবে ব্যাংকিংয়ের নামে, মানুষকে ঋণের জালে আটকিয়ে ফেলা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি রকমের যত অপকৌশল আছে সবই সুকৌশলে মানুষকে শিখানো হয়।

স্কুল কলেজের সিলেবাসকে এভাবেই সাজানো হয়েছে। যেনো সবাই ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। কেউ যদি ইসলামের আলো পেয়ে যায়, তাহলে সে সব ধোঁকা গুলো বুঝতে পারে। আর নয়তো এগুলোকেই সফলতার চাবি কাঠি মনে করে।

আরেকটা জিনিস বুঝার চেষ্টা করো, আব্বু। কেউ যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নাও হয়, কিন্তু দ্বীনের এলম অর্জন করে সে আখেরাতে পার পেয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। যদিও দুনিয়াতে কোনোরকম জীবন যাপন করুক না কেন, হাশরের ময়দানে সম্মানিত হবে। এবং জান্নাতে উন্নত জীবন যাপন করবে।

অন্যদিকে কেউ যদি দ্বীনের এলম অর্জন না করে, শুধুই দুনিয়ার সফলতার পিছনে দৌড়ায় সে হয়তো কিছু কাগজ (টাকা বা সার্টিফিকেট) কামাতে পারবে, কিন্তু কবরে বা হাশরের ময়দানে আটকে যাবে। আখেরাতে তার জীবন হবে বড়োই যন্ত্রণাদায়ক। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

আল্লাহ যদি কাউকে বিশেষ কোনো কারণে ক্ষমা করে দেন, সেটা তো ভিন্ন বিষয়।

আব্বু, আবারো শুনো রিজিকের জন্য পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর দুনিয়াতে রিজিক এবং আবাসের অভাব নেই। শুধুমাত্র সুষম বন্টনের অভাব। একটা গোষ্ঠী রিজিক কে কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে অন্যরা পাচ্ছেনা। আল্লাহ সবাইকে বিনামূল্যে রিজিক দিচ্ছেন।

আমি যদি ফল ও সবজি গাছ লাগাই। কে আমাকে বাধা দিবে? সেখান থেকে তো আমি বিনা মূল্যেই রিজিক পাবো। আবার যদি হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদি পালন করি সেখান থেকেও আমি গোশত, ডিম এবং দুধ বিনামূল্যে পাবো। পুকুর থাকলে মাছও চাষ করতে পারবো।

কিন্তু যেহেতু আমি এসব করতে পারছিনা। অন্যের উপর (কৃষক, জেলে, রাখাল, মহাজন, আড়ৎদার, ড্রাইভার, দোকানদার) ভরসা করতে হচ্ছে। তাই আমাকে তাদের পারিশ্রমিক দিতে হচ্ছে। আমি যেগুলো কিনে খাচ্ছি সেগুলো ঐসব খাবারে দাম নয়। বরং যারা আমাদের কাছে এসব পৌঁছে দিচ্ছে, তাদের পারিশ্রমিক বা খরচের মূল্য।

আবার আবাসের ব্যাপারটাও তাই, আল্লাহর জমিনে থাকার জায়গার অভাব নেই। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ, শহরে এসে ভিড় করে। ফলে মনে হচ্ছে জায়গার খুব অভাব। আর একজায়গায় ভিড় করাতে স্বাভাবিক ভাবেই বাসস্থানের খরচ বেড়ে যায়। সবমিলিয়ে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অনেক অনেক টাকার প্রয়োজন পরে।

এতকিছু বুঝানোর পর আব্বুর আওয়াজ কিছুটা নরম হলো। এবার বলছেন: "কিন্তু তাই বলে এতো ছোট বাচ্চাকে এতো লম্বা সময় মাদ্রাসায় রাখতে হবে? ওরা আরো বড় হোক। আপাতত স্কুলে পড়ুক। একটু বড় হলে, তারপর মাদ্রাসায় দিস"।

আমি বললাম: "পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে, যারা তাদের বাচ্চাদেরকে আরো ছোট বয়স থেকে আরো কঠিন প্রশিক্ষণ দেয়। সুতরাং এটা তেমন কোনো সমস্যা নয়। আমাদের দেশের ক্যাডেট কলেজের কথাই চিন্তা করো। ছোট্ট একটা ছেলে / মেয়েকেই তো একেবারে দূরে কোথাও ৬ / ৭ বছরের জন্য বনবাসের মতো দিয়ে দেয়া হয়। তখন তো কেউ প্রশ্ন তুলেনা, এতো ছোট বাচ্চাকে এভাবে বাবা-মার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়াটা কি ঠিক?

বাবা মা তো বরং আরো খুশি খুশিই সেখানে দিয়ে দেয়। কারণ এখান থেকে দুনিয়া কমানোর স্বপ্ন দেখে তারা। কিন্তু মাদ্রাসা ব্যাপারে উনারা উদাসীন। বাচ্চাকে মাদ্রাসায় দিয়ে জান্নাত পাওয়ার স্বপ্ন তারা দেখে না। তারা মনে করে দুনিয়া পেতে হলে অনেক চেষ্টা পরিশ্রম করতে হবে। আর জান্নাত এমনি এমনিই পেয়ে যাবে। কোনো চেষ্টা করা লাগবে না। শুধু শেষ বয়সে হজটা করে নিলেই হবে।

এরকম মানসিকতা বাদ দাও। বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকে যেভাবে গড়ে তোলা হবে, বাচ্চা সেভাবেই গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। সুতরাং এতো চিন্তার কিছু নেই। আখেরাতের পথে চলতে গেলেই শয়তানের বাধা আসে। যে দুনিয়া চায় তাকে তো আর শয়তান বাধা দিবেনা, বরং আরো সাহায্য করবে।

এখন আমি বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসায় দিতে চাচ্ছি। দুটো বাচ্চা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। এটা তো শয়তান হতে দিবে না। তাই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে আমাকে পেরেশান করার চেষ্টা করছে। ওরা আল্লাহর কালাম পড়বে, আর আল্লাহ ওদেরকে রিজিক দিবেন না?? অবশ্যই দিবেন। এবং অত্যন্ত সম্মান জনক রিজিক দিবেন। অতএব ভয় পেও না। কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাহাল্লাহ।

বহু চেষ্টা করে আব্বুকে রাজি করাতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। যদিও মন থেকে রাজি হয়নি।

আসলে, আব্বু মাদ্রাসাকে অপছন্দ করার পিছনে কিছু কারণ আছে। সে প্রসঙ্গে এখন কিছু কথা বলবো।

সাদা জুব্বার অন্তরালে:

আব্বুতো জীবনে অনেক কিছুই নিজ চোখে দেখেছেন, শুনেছেন। তিনি বাস্তবতার নির্মম চেহারাকে খুব কাছে দেখে দেখছেন। তাই অনেক কিছুই জানেন। আমি তো আর এতো কিছু জানিনা। তবে আমি নিজ চোখে যেসব জিনিস দেখেছি বা শুনেছি বা জেনেছি, তাই আজ আপনাদেরকে শুনাবো।

এই কথা গুলো শুনানোর আগেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ এখানে এমন মানুষদেরকে নিয়েই আলোচনা করা হবে, যারা প্রত্যেক দ্বীনদার মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। তাদের ভুল ধরার জন্য নয়, বরং নির্মম ও অনাকাঙ্খিত বাস্তবতাকে তুলে ধরার জন্যই এই আলোচনা।

আবারো বলছি, এই মানুষগুলো সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। হয়তো অনিচ্ছা বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ভুল করেছে। তাই এই অল্প সংখ্যক মানুষ দ্বারা সকলকে একই পাল্লায় নিয়ে আসাটা চরম বোকামি এবং মূর্খতা।

যেদিন থেকে দ্বীনের বুঝ পেয়েছি, সেদিন থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা গুলোই হয় আমার ঠিকানা। ঘরের বাহিরে থাকা মানেই এখানের কোনো একজায়গায় থাকা। সেই সুবাদে দ্বীনদার অনেকের সাথেই পরিচয় হয় এবং খুব কাছে থেকে তাদের জীবনকে দেখতে পাই। প্রথমেই আমার নিজের এলাকার মসজিদের কথাই বলবো। সেখানে একজন অবিবাহিত যুবক মুয়াজ্জিন ছিল। তিনি মসজিদেই বড় বড় মেয়েদেরকে আরবি পড়াতেন। তার থাকার কক্ষে মাঝে মাঝে অন্যান্য তোলাবারাও আসতো। তারা সবাই মিলে ওই রুমেই মোবাইল ফোনে অনাকাঙ্খিত ভিডিও দেখতো। আর মেয়েদের সাথে দুষ্টামি ফাজলামো তো থাকতোই। এটা তো কম বেশি সব মসজিদেরই কমন চিত্র। তাই মানুষের কাছে এটা কোনো গুনাহ মনে হয়না।

একই এলাকায় আরেক জন আলেম সাহেব, তার মাদ্রাসায় মেয়েদের সাথে অশালীন ব্যবহার করতো। এটাও আমাদের সমাজে কমন চিত্র হয়ে গেছে।

আশেপাশের যত মসজিদেই যাই, দেখি বড় বড় মেয়েদেরকে পর্দা ছাড়াই পড়ানো হচ্ছে। খুবই কষ্ট লাগে। আর ভয় হয়। কারণ শয়তান তো কত বড় বড় বুজুর্গকে নারীর জালে ফেলে ধ্বংস করে ফেলেছে। হয়তো তাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু শয়তান তাদেরকে হিপ্টোনাইজ করে যেনার দিকে নিয়ে যাবে। প্রায়ই তো এমন ঘটনা শুনতে পাচ্ছি।

এবার একটা মাদ্রাসার গল্প শুনুন। সেখানে এক ছাত্রের বাবা তার মোবাইলটা চেক করতে বললেন আমাকে। এবং অপ্রোয়জনীয় জিনিস ডিলেট করে দিতে বললেন। আমি ফোনের গ্যালারিতে ঢুকে তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কয়েকটা নীল ভিডিও। আমি উনাকে কিছুই বললাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম: "এই মোবাইলটা কার কাছে থাকে"? তিনি বললেন তার ছেলের কাছে। "ওর ওস্তাদ ওরে কি কি যেন দেখায়"। আমি চুপ চাপ ভিডিও গুলো ডিলেট করে ফোনের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে দিলাম। পাঠক, যে মাদ্রাসায় ছাত্র আর শিক্ষক মিলে এসব ভিডিও দেখে, সেখানে কি হয়? তা নিশ্চই আন্দাজ করতে পারছেন।

এখন আমার এক আত্মীয়ার (লিজা) মুখে কিছু আলেমের চেহারা চিনুন। ওই আত্মীয়া (লিজা) নিজেই আমাকে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো শুনিয়েছে। সে যখন ছোট ছিল, তাদের বাসায় তাদের কিছু পুরুষ আত্মীয় থাকতো এবং মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতো। কারণ, ওই ছাত্রদের ঢাকায় আর থাকার কোনো জায়গা ছিল না।

তারা লিজার চাচাতো মামা হতো। অর্থাৎ লিজার আম্মুর চাচাতো ভাই। তো, লিজার এই মামারা যখনি লিজাকে এক পেতো, তার সাথে খারাপ কিছু করার চেষ্টা করতো। কিন্তু লিজাকে আল্লাহ হেফাজত করতেন। বহুবার তারা চেষ্টা করেছে, প্রতিবারেই ব্যার্থ হয়েছে। পরবর্তীতে লিজাকে খুব ভালো একটি মেয়ে বলে সীকৃতি দিয়েছে তারা।

লিজা আমাকে আরো একটি ঘটনা শুনিয়েছে। বাংলাদেশের নামকরা এক আলেমের (নাম বললে সবাই চিনবেন) নাতি, লিজারই এক বান্ধবীর সাথে দীর্ঘদিন প্রেম করেছে। ছেলে মেয়ে দুইজনই মাদ্রাসার স্টুডেন্ট। পরে তাদের ব্রেকও হয়েছে।

এমনকি ওই ছেলে লিজার জন্যেও কয়েকটি ছেলে নিয়ে এসেছিলো, যেনো লিজাও এদের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দের একজনকে বেঁছে নিয়ে প্রেম করতে পারে।

এবার আপনাদেরকে আমাদের এলাকার জনপ্রিয় একজন আলেম সাহেবের ছেলের চরিত্র দেখাবো। এই ছেলেটাও এলাকার ভিতরে মোটামুটি ভালোই জনপ্রিয়। মুফতি হয়েছেন। একটা মসজিদের খতিব। আবার একটা মাদ্রাসার পরিচালক।

এতো গুলো পরিচয়ের কারণে সমাজে তার কদর অন্য রকম। আর তার জনপ্রিয় আলেম বাবার পরিচয় তো আছেই। তো এই আলেম সাহেব তার মাদ্রাসার শিক্ষিকাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। শুধু শিক্ষিকাই নয়, স্টুডেন্টদের মায়েদের সাথেও ছিল তার সম্পর্ক। কোনো মহিলা তার কাছে মাসআলা জানতে চাইলেও তিনি সুযোগ খুঁজতেন কিভাবে ওই মহিলার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কেউ যদি তার এসব আচরণের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাইতো, তাকে হুমকি দিতো। তার ক্ষতি করবে বলে শাসাতো। আর শিক্ষিকাদেরকে বেতন নিয়ে ঘুরাতো।

হয়রানি করতো। কয়েকবার তার বউর কাছে ধরাও খেয়েছে, তবুও সে তার এই চরিত্রকে দূর করতে পারেনি। উল্টো তার বউকেই গালাগালি করেছে। কিন্তু তার এই চেহারা সমাজের মানুষগুলো জানে না। সমাজের কাছে, তিনি একজন ফেরেস্তার মতো পবিত্র ব্যাক্তি। আমি এই মুফতি সাহেবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া একজন মহিলার কাছ থেকে এগুলো বিস্তারিত শুনেছি। আর তার আসল রূপটাও জেনেছি।

এতক্ষন আপনাদেরকে যেই লোকগুলোর কথা বললাম, এরা প্রত্যেকেই বেশিরভাগ সময় সাদা ধবধবে জুব্বা পরিধান করে। আর তাদের প্রধান হাতিয়ারই ছিল এটা। সাদা জুব্বার কারণে মানুষ তাদেরকে ফেরেস্তা মনে করে। এবং তারা এই সুযোগটাকে ভালো করেই কাজে লাগায়। এরকম আরো অনেক গুলো সাদা জুব্বা পরিহিত কালো অন্তরের মানুষ আছে আমাদের সমাজে। আমি আরো অনেকের কথাই জানি। কিন্তু আর বলতে ইচ্ছা করছেনা।

সাদা জুব্বা আমিও পড়ি। আমাকে দেখলেও যুবতী মেয়েরা সালাম দেয়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে এটুকু বুঝ দিয়েছেন যে, এই সালাম আমাকে নয়। বরং সাদা জুব্বা আর দাড়ি টুপিকে দেয়া হয়েছে। এই সালাম আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহকে দেয়া হয়েছে। ঠিক যেমনটা সামরিক বাহিনীতে ঘটে। একজন সৈন্য, তার অফিসারকে দেখলে স্যালুট দেয়। এই স্যালুট টা কিন্তু ওই ব্যাক্তিকে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে তার পোশাক ও কাঁধের উপরের থাকা রাংক কে।

কোনো মেয়ে যখন কোনো সাদা জুব্বা পরিহিত দ্বীনদার ব্যাক্তিকে দেখে, তখন সে তার হৃদয়ের পবিত্রতা থেকেই সালাম দেয়। একটু সোয়াব পাওয়ার আশায়। কারণ সাধারণ মানুষেরা সাদা জুব্বাধারীদেরকে পবিত্র মনের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবেই ভেবে থাকে। কিন্তু শয়তান তো আর বসে থাকেনা। মনের ভিতরে ওস ওয়াসা সৃষ্টি করতে থাকে। তাই এসব ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। আর যুবতী বোনদের উচিত নয়, কোনো যুবক আলেমের কাছে গিয়ে মাসআলা চাওয়া। উত্তম হচ্ছে নিজের পুরুষকে পাঠানো। আবার কোনো যুবক আলেম যদি কোনো মহিলাকে মাসআলা দিতে গিয়ে নিজেই ফেতনায় পরে যায়, তাহলে তার মাসআলা দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। এবং ওই মহিলাকে অন্য কোনো আলেমের কাছে পাঠিয়ে দেয়া উচিত বা তার স্বামীকে আসতে বলা উচিত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উত্তম বুঝ দান করুন। উম্মাহর রাহবারদেরকে সকল ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। শয়তানের চক্রান্ত থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখুন। তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে জমে থাকা সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখুন। আলেমদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

আরো কিছু পারিবারিক ফেতনা:

নিজের পরিবারের অনেক ফিৎনাকেই দমন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। অনেক ফেৎনাকে উপেক্ষা করেছি যেন সেটার আকার আর বড় হতে না পারে। এভাবে মোটামুটি একটা ভারসম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বেশিরভাগ সময়ই এই ফেতনার দানবের সাথে পেরে উঠিনা। তবে হালও ছাড়িনা। দুনিয়ার জীবন পুরাটাই তো পরীক্ষার হল। একটার পর একটা পরীক্ষা তো আসবেই। আর আল্লাহও আমাকে রিকভার করে উঠার তৌফিক দান করেন। নিজের পরিবারের বেশিরভাগ ফেতনা সম্পর্কেই আপনাদেরকে বলেছি। বেশিরভাগই এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। মোটামুটি ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ।

এর মধ্যে ছোট ভাইর বিয়ের হয়েছে। এতে আরো খুশি হলাম যে, এখন হয়তো আম্মু নিজের ছোট পুত্র বধূকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তখন আর নিসার সাথে আম্মুর খুব একটা গন্ডগোল হবে না। কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি। বিয়ের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে গন্ডগোল। আব্বু এই বিয়েতে অনেক খরচ করছে। নিজের কাছে টাকার কমতি থাকায়, ধার করেছে। আর আমি আমার বিয়ের সময় আব্বুর কাছে একটা টাকাও চাইনি। নিসাকে তখন কিছুই দিতে পারিনি। এসব কারণে কোথায় আমাদের প্রতি খুশি থাকবে, তা নয়। উল্টা আমাদেরকে বলে আমরা নাকি আল্লার ওয়াস্তে ফকিরী বিয়ে করছি। রিলিফের মাল নিয়ে আসছি।

এসব কথা শুনে নিসা যেমন কষ্ট পেয়েছে, আমিও কষ্ট পেয়েছি। তখন আব্বুর টাকা ছিল না, তাই নিসাকে সাজিয়ে আনতে পারিনি। এখন যেহেতু ধার করে অনুষ্ঠান বা কেনাকাটা করছেই, আমরা চেয়েছিলাম দুই বৌকেই একইরকম সাজানো হোক। কিন্তু আমাদের সেই আশাও পূরণ হয়নি। বরং অপমান হতে হয়েছে। নতুন বৌর জন্য অনেক কিছুই করছে। কিন্তু নিসার জন্য কিছুই করেনি। এসব দেখে নিসা খুব কষ্ট পায়।

আবার আব্বু আম্মুকেও নতুন বৌর উপর খুব সন্তুষ্ট দেখা যাচ্ছে। অথচ নিসার উপরে তারা এমনটা ছিলোনা। নিসাকে আমি বুঝাই, দেখো নিসা। তুমি আর লিনা এক নও (আমার ছোট ভাইর বৌর নাম লিনা)। ও তো পর্দা করেনা। সবার সাথে দেখা করে। হাসতে পারে। গল্প করতে পারে। আর আব্বু এটাই পছন্দ করে। তুমি তো আর সেটা পারো না, বা পারবা না। তোমার এই পর্দা করাটা তো আব্বু পছন্দ করেনা। তোমাকে যখন আমার চাচাদের সামনে আসতে বলেছিলো, তুমি পর্দার জন্য আসোনি। এটা তো আব্বু বুঝেনা। কিন্তু লিনা তো ঠিকই সবার সামনে আসে, এবং আসবে। আর এটাই আব্বু চায়। সুতরাং ও একটু বেশিই আদর পাবে। আমরা যেরকম কঠোর ভাবে দ্বীনকে পালন করতে চাই, ওরা তো সেটা করবেনা। ওরা তো আব্বুর মতোই মডারেট। তাই ওরা আলাদা সাপোর্ট পাবে এটাই স্বাভাবিক। এটাই তো আমাদের জন্য পরীক্ষা। বর্তমানে আমরা ভয়ংকর ফেতনার জমানায় আছি।

সামনে তো আমাদেরকে আরো কঠিন কঠিন পরীক্ষার সমুক্ষিন হতে হবে। তাই শক্ত হতে হবে। এতো অল্পতেই ভেঙে পড়লে চলবেনা। এভাবেই বুঝিয়ে নিসাকে শান্ত করি।

কিন্তু ফেতনার তো শেষ নেই। ফেতনার সাগরে একটার পর একটা ফেতনার ঢেউ আসতেই থাকে।

নিসার বোন হাফেজা। বিয়ে হয়েছে একজন আলেমের সাথে। সুতরাং তারা একটা আলেম দম্পতি। আলেম সাহেব তার হাফেজা বউকে খুশি করার জন্য জন্মদিনে দামি কেক নিয়ে এসে সারপ্রাইজ দেয়। কিন্তু আমি (আনাস) তো কোনো দিন নিসার জন্মদিন পালন করিনি। তারা তাদের ম্যারিজ ডে পালন করে, আমি তো করিনি। অন্যান্য অপসংস্কৃতি গুলোও পালন করে, আমি তো করিনি। আমাদের আরো আলেম আত্মীয়দেরকে বিভিন্ন অপসংস্কৃতি পালন করতে দেখা যায়। আমি কেন করিনা?

এক্ষেত্রে নিসা মনে করে আমি ওকে বঞ্চিত করি। টাকা বাঁচাই। সবাই সব করছে, আলেমরাও করছে। নিজের বৌকে খুশি করতে সবই তো করছে, তাহলে আমি আনাস কেন করিনা??

এখানেও আমি নিসাকে বুঝাই যে, আলেম একটা ভুল কাজ করলেই কি সেটা সহীহ হয়ে যাবে?? ভুল তো ভুলই। সেটা যেই করুক। এখন কোনো আলেম যদি গান শুনে বা মদ খায়, তাহলে কি আমাকেও সেটা করতে হবে। আলেম তো দলিল নয়। দলিল তো কুরআন ও হাদিস। আমরা সেটা তাদের কাছ থেকে শিখে নেই। তুমি তো স্কুল কলেজে পড়ছো। তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছো। তোমার শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই স্মোক করতো নিশ্চই। তাই বলে কি তুমিও সেটা করেছো? বা কারো কি করা উচিত? শিক্ষক করেছে, তাই আমিও করবো। যেহেতু তিনি করেছেন, তাহলে এটা খারাপ হতে পারেনা। এমন ভাবনা নিশ্চই কোনো বিবেকবান মানুষ করেনা। সবাই জানে, সিগারেট একটা খারাপ জিনিস।

একই ভাবে আলেমদের কাছ থেকে আমরা দ্বীন শিখবো। কিন্তু আমরা যেটাকে ভালো করেই জানি যে, এটা বিধর্মী সংস্কৃতি সেটা তো পালন করতে পারিনা। যদিও সেটা কোনো আলেমকে করতে দেখা যায়। ফেতনার জমানায়, কেউই ফেতনা মুক্ত নয়। ফেতনা সবাইকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তাই ফেৎনাকে চিনতে হবে এবং বাঁচতে হবে। হাল ছাড়া যাবেনা, হতাশ হওয়া যাবেনা।

তোমাকে আমি সবই দিবো। কেকও খাওয়াবো। কিন্তু সেটা কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে নয়। ঠিক আছে নিসা??

তুমি কি আমার কথা গুলো বুঝতে পারছো?? নিসা মাথা নেড়ে ইতিবাচক সারা দিলো।

কিন্তু আমি মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশাস ছাড়লাম। আর মনে মনে ভাবছি। হায় ফেতনা? হায় দাজ্জালি ফেতনা? সবাইকে ঘিরে ধরেছে। কেউ বাঁচতে পারছেনা। নিজের পরিবারকেও বাঁচাতে পারছিনা। উম্মাহর চিন্তা করবো কি?? ওদেরকে বুঝানো বুঝাতেই হয়রান হয়ে যাই, ক্লান্ত হয়ে যাই। কখনো হতাশ হয়ে যাই। মাঝে মাঝে ভাবনা আসে, আগের মতোই হয়ে যাই। তাহলে আর এতো ফেতনা দেখতে হবেনা। কিন্তু আল্লাহ আবার আমাকে শক্তি দান করেন। আমি দ্বীন থেকে দূরে সরতে চাইলেও আল্লাহ আমাকে ফিরিয়ে আনেন। যখন খুব হতাশ হয়ে যাই, আল্লাহ আমাকে এমন কিছু স্বপ্ন দেখান, যা দেখে আমি আবার জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি। তখন আর এই ফেতনাগুলোকে তেমন কিছুই মনে হয়না।

তবে এই সমাজ ও পরিবার থেকে অনেক দূরে সরে যেতে মন চায়। অনেক দূরে। আগে পরিবার সহই হিজরত করতে চাইতাম। কিন্তু এখন একাই চলে যেতে ইচ্ছা করে।

ফেৎনাময় সমাজ:

প্রত্যেক ঈমানদার মাত্রই খুব ভালো করে জানেন যে, আমরা ভয়ংকর এক ফেৎনাময় সমাজে বসবাস করছি। যেদিকে তাকাই, শুধু ফেতনা আর ফেতনা। একটু সুক্ষ দৃষ্টি দিলে আর অন্তর চক্ষু দিয়ে তাকালে সব ফেতনা গুলোকে স্পষ্ট বুঝা যায়। বিচক্ষণ পাঠকদেরকে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। তবুও একটু স্মরণ করিয়ে দিবো। আসলে আমি আনাস প্রতিদিন যেসকল ফেতনার মুখোমুখি হই, সেগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সাথে আমার অনুভূতি গুলোও শেয়ার করবো।

মানুষের দিন শুরু হয় ঘুম থেকে উঠার পর। আমাদের সমাজটা এখন এমন হয়ে গেছে যে, ঘুম থেকে উঠেই কোনো না কোনো দিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসে। কখনো ঝগড়া ঝাটির আওয়াজ আসে। কখনো নিজের ঘরেই গন্ডগোল শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারাও দেখা যায় ঘুম থেকে উঠেই কার্টুন দেখতে বসে যায়। রাস্তায় বের হলে চারদিক থেকে গানেরই আওয়াজ আসতে থেকে। নোংরা পোস্টারে থাকে সবদিক ভরপুর। বিজ্ঞাপনের নামেও সর্বত্র নারীর খোলামেলা ছবি।

বেশির ভাগ মানুষের হাতে থাকে আগুন আর ধুয়া (সিগারেট)। অধিকাংশ নারীই রাস্তায় পর্দাবিহীন অবস্থায় চলছে। এমনকি দ্বীনদার মহিলারাও নিজে তো পর্দা করা থাকে কিন্তু নিজের মেয়ে বাচ্চীটাকে ওয়েস্টার্ন পোশাক পরিয়ে রাস্তায় বের করে। অধিকাংশ মানুষের কানে থাকে এয়ারফোন। হয় গান, নাহয় মুভি, নাহয় নাটক, কোনো একটা তার মোবাইলে চলতে থাকে। বাসে উঠার পর যাত্রী আর চালক, হেল্পারের তর্ক বিতর্ক তো প্রতিদিনই দেখতে হয়। মারামারি শুরু হলে কেউ তো থামায়ই না, উল্টা আরো উৎসাহ দেয়। আর বলে আরো মারেন। মর মর। মইরা যা। অমুকের পোলা, তমুকের পোলা।

বাসের এই চিত্র তো খুব কমন। সাথে থাকে আরেক ফেতনা। টিভির ফেতনা। বেশির ভাগ বাসেই এখন টিভি আছে। আর উঠেই দেখি হয় গুনাহের কিছু একটা চলছে। আমি অবশ্য বন্ধ করতে বলি। কিন্তু অন্যান্য বাসের কথা ভাবি। প্রতিদিন কত গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটছে। আর গাড়ি গুলোতে গান চলতে থাকে। মৃত্যুগুলো হয় এই অবস্থায়?? আরো একটা ফেতনা দেখা যায় বাসে। সেটা হলো সিটিং জেনা। পিছনের ছিটগুলো হয়ে উঠেছে প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটানোর দারুন এক স্থান। বাস গুলোয় উঠে খুব ভয়ে থাকি। কখন যে আল্লাহর আজাব চলে আসে??

অফিসে যাওয়ার পথে দেখি অসংখ্য মেয়ে রিজিকের সন্ধানে গার্মেন্টসের দিকে ছুটছে। ইনারা সকাল ৮ তা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত খুব খাটা, খাটে অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে। হয়তোবা বাধ্য হয়েই তাদেরকে এটা করতে হয়। অনেকে তো পর্দা করেই না। অনেকে আবার করতে চাইলেও পারেনা। নারীদের তো ঘরে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ইসলামের চর্চা না থাকায়, ওই নারীর পুরুষেরাও ব্যাপারটা বুঝেনা, আবার নারীরাও বুঝেনা।

ছাত্ররা নিজেদেরকে স্টুডেন্ট পরিচয় দিয়ে অর্ধেক ভাড়া দেয়। আবার কেউ কেউ ভাড়াই দিতে চায়না। এটা নিয়েও শুরু হয় গন্ডগোল। অথচ ওই ছেলেই সিগারেট ও তার বান্ধবীর পিছনে অসংখ্য টাকা খরচ করে। অনেক যাত্রী আছে যারা বিভিন্ন উপায়ে বাসের ভাড়া ফাঁকি দিতে চায়। আবার অনেক হেলপার আছে, যারা যাত্রীর টাকা মেরে দিতে চায়।

বাসে উঠা ও নামার সময়, হেলপাররা সুকৌশলে মহিলা যাত্রীদের শরীরে হাত দিচ্ছে। কখনো পুরুষ যাত্রীরাও একই কাজ করছে। আরো অনেক কিছুই তো হয় নারীদের সাথে। ধর্ষণ করে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেয়াটাও এখন কমন বিষয় হয়ে গেছে।

ভাড়া নিয়ে গন্ডগোল হলেও একই কাজ করে। যাত্রীকে বাস থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। বাসের ভিতরেও মাঝে মাঝে নোংরা পোস্টার দেখা যায়। ইদানিং আবার কালো জাদুর লিফলেট দেখা যাচ্ছে অধিক হারে। কালী (জীন শয়তান) সাধকরা (শয়তান পূজারী) নাকি যে কোনো কাজ করে দিতে পারে। এমন পোস্টার এখন বেশিরভাগ বাসেই দেখা যাচ্ছে।

সিএনজি, মাইক্রো এবং ট্যাক্সি গুলোতে চলছে ডাকাতি। কখনো চালক নিজেই তাদের সহযোগীদের নিয়ে যাত্রীর উপর হামলা করছে। আবার কখনো ছিনতাইকারী, যাত্রীর বেশে চালকের উপর হামলা করছে। মানুষ পুলিশের কাছেও পর্যাপ্ত সহযোগিতা পাচ্ছেনা। উল্টো হয়রানি হতে হয়।

রাস্তার আরেকটি ফেতনা হলো হিজড়া ও বাইদানি। তারা পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা না পাওয়ায় এখন পথিক বা যাত্রীদের উপর মানসিক হামলা করে। বিভিন্ন ভাবে পেরেশান করে টাকা নিয়ে নেয়।

সবাই যখন যেখানে পারছে সেলফি নিয়েই ব্যাস্ত। দ্বীনদাররাও আজ এই রোগে আক্রান্ত। বিপদে আপদে আল্লাহকে কেউ স্মরণ করতে চায়না। আল্লাহর স্থানটি এখন দখল করে নিচ্ছে ইমার্জেন্সি কল নাম্বার 999। যেটাকে উল্টালে হয় 666 / ৬৬৬ বা মার্ক অফ দা বিস্ট বা দাজ্জাল। অর্থাৎ মানুষকে দাজ্জাল বা শয়তানের কাছে সাহায্য চাওয়া শিখানো হচ্ছে। এছাড়াও তো আরো বিভিন্ন ভাবে দাজ্জালি কালচারকে পুরো সমাজ তথা পৃথিবীতে জালের মতো ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর মানুষ দলে দলে মশা মাছির মতো সেই জালে ফেঁসে যাচ্ছে এবং দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাচ্ছে।

বেশিরভাগ মানুষ সমাজের পরিবর্তন (মূলত ফেতনা) গুলোকে আধুনিকতা ও ট্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছে। নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলো যাচাই বাছাই ছাড়াই প্রগতির নামে ব্যবহার করা শুরু করে দিচ্ছে। এবং ধীরে ধীরে এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি এবং কোচিং গুলো হয়ে গেছে যেন একটা প্রেম নগর। ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়াশুনার বদলে প্রেম করতেই বেশি আগ্রহী। ছাত্র ছাত্রী বা ছাত্রী শিক্ষক।

আবার ছাত্র রাজনীতির নামে চলছে ছাত্র সন্ত্রাস। এরা আবার প্রায়ই সময় ছাত্রী হোস্টেলগুলোতে হামলা চালায় আর নিজের পছন্দ মতো কাউকে বেঁছে নেয়। অসহায় ছাত্রী গুলো জানের ভয়ে কিছু বলতেও পারেনা। বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়, নিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটুকু।

দুর্নীতি এখন শিক্ষকদেরকেও গ্রাস করে নিয়েছে। যারা ছিলেন সমাজ নির্মাতা তারাই আজ সমাজ ধংসকারীর ভূমিকায় এগিয়ে যাচ্ছেন।

সমাজের সবচেয়ে বাজে লোকটি আজ সমাজের নেতৃত্বের আসন দখল করে আছে। আর সবচেয়ে ভালো মানুষটির কোনোই মর্যাদা নেই।

মিথ্যাবাদীকে সম্মান দেয়া হচ্ছে। আর সত্যবাদীকে অপমান অপদস্ত করা হচ্ছে। সন্ত্রাসী ও লম্পটরা ভালো মানুষদেরকে চারিত্রিক সার্টিফিকেট বিলি করছে।

শিশু কিশোররা সারাদিন গেম্স্ নিয়ে ব্যাস্ত। এগুলোর কারণে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। উগ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মারা মারি আর হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোরীরা পছন্দের জামা না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। কেউ আবার তার পছন্দের দল বিজয় লাভ করেনি বলে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলছে।

নারী, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ কেউই কোনো ফেতনা থেকে মুক্ত নয়। ছোট্ট ছোট্ট কারণে একে অপরকে মেরে ফেলছে। আত্মহত্যার প্রতিযোগিতা চলছে চারদিকে। ধর্ষণ, খুন, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই তো প্রতিদিনের ঘটনা।

ঘন্টায় ঘন্টায় তালাক হচ্ছে। অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আর পরকীয়া তো একেবারেই কমন। দ্বীনদাররাও পিছিয়ে নেই।

ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করেনা। বড়রা ছোটদেরকে আদর বা স্নেহ করেনা। সন্তানেরা বাবা মায়ের চেয়ে বৌ বা বন্ধুকে বেশি গুরুত্ব দেয়। পারিবারিক সম্পর্ক গুলো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সবাই অবৈধ কার্যকলাপ আর ভার্চুয়াল দুনিয়াতে সুখ খুঁজছে। কিন্তু কেউ কোথাও সুখ পাচ্ছেনা।

এমনকি দ্বীনদাররা মসজিদে গিয়ে একটু যা শান্তি পেতো, তাও এখন আর পাওয়া যায়না। সবার পকেটে থাকে ফোন। একটু পর পর গান বেজে উঠে। মানুষ অল্পতেই মসজিদেও হৈ হুল্লোড় শুরু করে দেয়। উচ্চ আওয়াজে কথা বলে। কমিটিতে থাকে সমাজের সবচেয়ে খারাপ মানুষ গুলো। আমলের বদলে নিজের প্রভাব খাটানোর কাজেই তারা মসজিদকে ব্যবহার করে বেশি। ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবের সাথেও তারা দুর্ব্যবহার করে। কিছু কিছু মসজিদের কমিটিতে তো নারীকেও রাখা হচ্ছে। তারা চেয়ার টেবিল এনে মসজিদে মিটিং (ফাও গল্প) করে।

বাজারে গেলে বিশুদ্ধ খাবার পাওয়া যাচ্ছেনা। সবকিছুতে বিষাক্ত ক্যামিকেল দেয়া। ওগুলো খেয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর পর দৌড়াচ্ছে হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতাল গুলোতে অদ্ভুত অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত মানুষের ভিড়। সেখানেও চলছে ফেতনা। চলছে টিভি। থাকছে সুন্দরী নার্স। ঈমান নিয়ে মরার সুযোগটাও বন্ধ রাখা হয়েছে। আর রোগীদের নিয়ে অপারেশন ও টেস্টের নামে অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা তো আছেই। এসব নিয়েও হচ্ছে রোগীর পরিবার আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি। এমন কি হত্যাকান্ডও।

আমরা প্রত্যেকেই এসব ঘটনার সাথে কম বেশি পরিচিত। অনেকে ভুক্তোভোগীও। প্রকৃত মুমিনের জন্য পুরো সমাজটা বিষাক্ত হয়ে গেছে। তারা ফেতনার দানবটির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। মুমিনরা হারে হারে টের পাচ্ছে, দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার। আর শেষ জমানায় ঈমানকে হাতে রাখা কতটা কঠিন। আধুনিক ও মডারেটরা এগুলো কখনোই বুঝবেনা। এগুলোকে তারা ফ্যাশন ও ট্রেন্ড হিসেবেই গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং নিবে। এই সমাজে চলতে আমার (আনাস) খুব কষ্ট হয়। বার বার মনে হয় দূরে কোথাও হিজরত করি। যেখানে ঈমান নিয়ে বাঁচতে ও মরতে পারবো।

সূরা কাহাফও তো আমাদেরকে সেই নির্দেশই দেয়। অর্থাৎ নিজের ঈমান বাঁচানোর জন্য আসহাবে কাহাফের ৭ যুবকের মতো এই কুফুরী ও ফেতনাময় সমাজ ছেড়ে দূরে কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যাওয়া। আল্লাহর রাসূল তো আরো স্পষ্ট করেই এ সময়ের করণীয় বলে দিয়েছেন। এরকম ফেতনার ঢেউর সময়, হয় লাশের মতো নিজের ঘরে পরে থাকতে হবে নয়তো নিজের ধন সম্পদ নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেতে হবে।

হযরত উম্মে শুরাইক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, দাজ্জালের ভয়ে পলায়ন করে মানুষ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শুরাইক রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! আরব সম্প্রদায় তখন কোথায় থাকবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরব সম্প্রদায় তখন সংখ্যায় অল্প থাকবে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৯৪৫)

আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মাঝে যে যুগ আসবে তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এইভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে।

(আহমাদ ১২৩৪৭, বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৬, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দণ্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

(মুসলিম ৭৪২৯,, মিশকাত ৫৩৮৪)

অতীতের সুন্দর দিনগুলো:

আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলো ছিল ছাত্র অবস্থায় দ্বীনের মেহেনত করা দিনগুলো। মেহেনত, কিতাব অধ্যয়ণ আর আলেমদের সোহবতে সময়গুলো কেটে যেত অত্যন্ত মধুর ভাবে। মনে হতো, দুনিয়ার বুকেই জান্নাতে আছি।

অলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে, চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, বাজারে সবজায়গায় গিয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতাম। বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথ হারা ভাইগুলিকে মসজিদে নিয়ে আসতাম। তাদেরকে আরো বেশি মসজিদ মুখী করার জন্য মাঝে মাঝে তাদের জন্য মসজিদে খানার আয়োজন করতাম। ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতাম।

ওদের বলতাম: "দেখো তোমরা তো এখন ছাত্র। তোমরা পড়াশুনা কেন করছো? নিজের ভবিষ্যতের জন্য। নিজের ক্যারিয়ারের জন্য। তাই না? আচ্ছা ভালো কথা। কিন্তু আমরা তো জানি আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ কোথায়? আমি যদি আজ মারা যাই, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ হচ্ছে কবর, হাশর। আমি শুধু দুনিয়ার ক্যারিয়ারের কথা ভাববোনা। আমাকে আখেরাতের ক্যারিয়ারের কথাও চিন্তা করতে হবে। সেখানেও আমাকে সফল হতে হবে। সম্মানিত হতে হবে। আমরা দুনিয়াতে সম্মানিত হবো, আখেরাতেও সম্মানিত হবো। ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ?? যে আখেরাতের সফলতার জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও সফলতা দান করেন। তাই পড়াশুনার পাশাপাশি মসজিদে একটু সময় দিও। অবসর সময়ে বা খেলার সময় মসজিদে চলে এসো। ঠিক আছে"??ছাত্ররা ঠিক আছে বলে চলে যেতো। কেউ কেউ ঠিকই পরের দিন মসজিদে চলে আসতো। এভাবে অনেকেই দ্বীনের উপর ফিরে আসতো, মাশাআল্লাহ।

সবাই মিলে এলাকার ভিতর দ্বীনের মেহেনত করতাম। অন্য রকম এক রহমতের পরিবেশ কায়েম হয়ে গিয়েছিলো, আমাদের ছোট্ট এলাকাটির ভিতরে। সব রকম

অপরাধও দূর হয়ে গিয়েছিলো। সংগঠন করে যে জিনিস চেয়েছিলাম, অর্থাৎ এলাকার ভিতরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম, সেটা দ্বীনের মেহনতের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। মুয়াজ আমাদের মসজিদে বিয়ে করে, সুন্নতি বিয়ে দেখিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলো। আরো অনেক গুলো পরিবর্তন এলাকার ভিতর এসেছিলো আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিন দাওয়াতের কাজ করতাম বলে, রাতে ঘুমের মধ্যেও ঐরকমই স্বপ্ন দেখতাম আর মনটা খুশিতে ভরে যেতো।

যেই স্বপ্নটা আমাকে দ্বীনের পথে চলতে সবচেয়ে বেশি শক্তি প্রদান করে, সেটা হলো: " আমি এক যুদ্ধের ময়দানে আছি। চারদিকে যুদ্ধ হচ্ছে। যে যার মতো যুদ্ধ করছে। কিন্তু আমি একটি ব্যাক্তিকে জড়িয়ে ধরে আছি। আর অনেক গুলো তীর এসে আমার পিঠে লেগেছে। কিন্তু আমি জানি না মানুষটি কে? অনেক পরে সেই ময়দান থেকেই জানতে পারলাম, তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল (স:)। আমি তো এ কথা জানতে পেরে খুশিতে আত্মহারা"। ঘুমটা ভেঙে গেলো। মনে হলো আবার ঘুমাই। আবার স্বপ্নটা দেখি। এতো ভালো লাগছে।

আবার একটু দ্বিধায় ও পড়ে গেলাম। আসলেই কি তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন? তবে যাই হোক, এটা থেকে আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ আমাকে দিয়ে তার রাসূলের দ্বীনের হেফাজতের কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিবেন। আর হয়তোবা আমার মৃত্যু লড়াইয়ের ময়দানে হবে। আর আমি তো এমনটাই দোআ করি। আমার যেন শহীদি মৃত্যু হয়। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কত সুন্দর ছিল আমার ওই দিনগুলো। আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে সেই সুগন্ধিময় মুহূর্তগুলো। জানি, তা তো আর সম্ভব নয়। তবুও কল্পনায় মাঝে মাঝে ফিরে যাই। আর মনে মনে সুখ নেই।

২০২০ ও ২০২১ এর অদ্ভুত কিছু ফেতনা:

এমনিতেই পুরো পৃথিবীকে ফেতনার অক্টপাস চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। মুমিনদের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। দিন দিন জীবনটা অত্যন্ত জটিল হয়ে যাচ্ছে। দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে মুমিন সহ সকল সাধারণ জনগণ। এর মধ্যেই হঠাৎ করে শুনা যায় করোনা (covid -19) নামক একটি ভাইরাস কোনোভাবে চায়নাতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সময়টা ২০১৯ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বর। এটা নাকি খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পুরো বিশ্ব আতংকিত। বাংলাদেশ তখনও বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেনি। কিন্তু 2020 এর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে যখন একজন করোনা রোগী পাওয়া গেলো, তখন এদেশের টনক নড়েছে।

মার্চ মাসে মানুষ নতুন একটি শব্দের সাথে পরিচিত হলো। লকডাউন।

সবার ভিতরে অজানা এক ভয় আর তীব্র উত্তেজনা কাজ করছে। কি জানি কি হয়ে যায়। সবাই নিজেরাই নিজেদেরকে লকডাউন (বন্দি) দিয়ে দিচ্ছে। এলাকা বা বাসার ভিতরে নিজেদেরকে আটকে নিচ্ছে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে কোয়ারেন্টাইন (একঘরে) দিয়ে দিচ্ছে। বার বার গোসল করছে। হাত ধুচ্ছে। স্যানিটাইজার ব্যবহার করছে। মুখে মাস্ক থাকছে সারাক্ষন। আবার অতি সচেতনরা পিপিই, ফেস শিল্ড, গ্লাভস, বড় চশমা ইত্যাদি পড়ে নিজেকে হেফাজত করছেন। যেন কোনো ভাবেই এই ভয়ংকর জীবাণুটি তাকে ধরতে না পারে। অদেখা এক জীবাণুর ভয়ে পুরো বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আতংকিত। বাহিরে বের হলেই মনে হচ্ছে চাঁদে চলে এসেছি। চারদিকে নভোচারীর মতো ব্যাক্তিরা ঘুরাফেরা করছে।

মসজিদ গুলোর উপরেও রেস্ট্রিকশন চলে আসলো। উম্মাহর রাহবাররা যাচাই বাছাই ছাড়াই সুন্নাহ বিরোধী (নামাজে ফাঁকা হয়ে দাঁড়ানো, মাস্ক পড়ে নামাজ পড়া, মুসাফা ও মুআনাকা থেকে বিরত থাকা, রোগীকে দেখতে না যাওয়া ইত্যাদি) সকল আইন গুলো মসজিদ ও মুসল্লিদের উপর এপ্লাই করে দিলেন।

করোনার বিষয়টি আমি মেনে নিতে পারলাম না। তাই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলাম।

ঘাটাঘাটি করে বুঝলাম এটা একটা সাধারণ সিজনাল ফ্লু। প্রতি বছরেই মানুষ এরকম জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগে। আবার অনেকে মারাও যায়। এটা খুব কমন একটা বিষয়। তাহলে এ বছর এই সাধারণ ফ্লুটাকে এমন ভয়ংকর বানিয়ে প্রচার করার কারণটা কি??

আর মিডিয়াতে এতো মানুষের মৃত্যু দেখানো হচ্ছে, সেটারই বা কি কাহিনী??

তার আগে বলে নেই করোনার উৎপত্তি, কারণ, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে রূহ মাহমুদ ভাইয়ের এজ অফ ডার্ক ফিতনা বইটা পড়তে পারেন। সেখানে এসব বিষয়ে লিখা আছে। অনলাইনে পিডিএফ পাবেন। ভবিষতে নাকি হার্ড কপিও বের হবে বলে শুনেছি। তবুও আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারে খুব সংক্ষেপে কিছু বলছি। যেনো মূল বিষয়টা বুঝতে পারেন। আমার পড়াশুনা থেকে আমি দুটি বিষয়কে সামনে রেখেছি।

১) সাধারণ সিজনাল ফ্লুকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত বা মৃত সকল রোগীকেও করোনা রোগী বা মৃত্যু বলে চালানো হচ্ছে।

২) এটা একটা বায়ো ওয়েপন। বা জীবাণু অস্ত্র। সাধারণ জীবাণুটাকেই কিছুটা মডিফাই করে ছেড়ে দিছে। আর এটা কোনো ছোয়াচে রোগ নয়। মহামারী তো নয়ই। তবে মোডিফাই করার কারণে রোগের সিম্পটম্প গুলোতেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

তবে রোগের ধরণ যেটাই হোকনা কেন, আন্তর্জাতিক শয়তানি চক্রের প্রধান টার্গেট হচ্ছে লকডাউন।

এই করোনা, লকডাউন আর ভ্যাকসিন নিয়ে কত মানুষ যে কতরকম হয়রানির শিকার হচ্ছে, তার তো কোনো হিসেবই নেই। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। তাই খুব ভালো করেই বুঝি। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন নিয়ম নীতি আসছে এই করোনা আর লকডাউন বা শাটডাউনকে কেন্দ্র করে।

এবার আসুন লকডাউনের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি। বর্তমান বিশ্ব করোনা ও লকডাউনের নামে যে নাটক দেখতে পাচ্ছে, তার পরিকল্পনা অনেকে আগেই করা হয়েছে। দাজ্জালের বাহিনী তো অনেকে আগে থেকেই দাজ্জালের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করছে। তাদের খুব শক্তিশালী ও বহু প্রতীক্ষিত প্রজেক্ট এটি। এটা দিয়ে তারা অনেকে গুলো কাজ একসাথে করতে চাচ্ছে।

১) পুরো বিশ্বের মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ। তারা দেখতে চাচ্ছে কারা তাদের কথা শুনে এবং মানে? কারা ঠিক ঠাক মতো মাস্ক পরে এবং নিজের মুখকে বন্ধ (চুপ) রাখে? না মানলে আর্মি নামিয়ে দিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে।

২) পরবর্তীতে ভ্যাকসিন দিয়ে ব্যবসা এবং মানুষকে আরো অসুস্থ বানিয়ে রাখা। এরও আরো পরে ভ্যাকসিনের উন্নতিকরণের নামে শরীরে মাইক্রো চিপ ঢুকিয়ে দেয়া। যেনো প্রত্যেকটা মানুষকে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩) কড়া লকডাউন দিয়ে সফরকে সীমিত করা। কেউ যেনো দূরে কোথাও সফর বা হিজরত করতে না পারে। বা ইমাম মাহদীর জামাতে শরিক হতে না পারে।

৪) সবকিছুর উপর লকডাউনের কথা বললেও মূলত এপ্লাই হচ্ছে মসজিদ মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থান গুলোর উপরে।

৫) হজকে সীমিত করার নামে মক্কায় বিশেষ লকডাউনের ব্যবস্থা করা। হাজির সংখ্যাকেও সীমিত করা হয়েছে। এবার (২০২১) সালে টীকা ছাড়া হজও করতে পারবেনা মানুষ। এসব থেকে যেটা বুঝা যায়, তারা ইমাম মাহদীকে গ্রেফতারের পায়তারা করেছে। হাজির সংখ্যা কম হলে ধরতে সুবিধা হবে। তাও না পারলে টিকা কার্ডের মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করবে। আমরা জানি না ইমাম মাহদী কবে আত্মপ্রকাশ করবেন? কাফেররাও জানে না। কিন্তু তারা প্রস্তুতি ঠিকই নিয়ে রেখেছে। আগামী বছর গুলোতেও হয়তো তারা এরকমই বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিবে। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।

৬) লকডাউনের কারণে অনেকেই ব্যবসা ও চাকুরী হারিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আর এলিটরা এটাই চায়। ধনীরা টিকে থাকুক আর গরিবরা মরে যাক। এবং মধ্যবিত্তরা কোনো রকম বেচেঁ থাকুক, যেনো তাদেরকে দিয়ে পরবর্তীতে আরো ভালো করে দাসত্ব করানো যায়।

৭) লকডাউনের মাধ্যমে কৃত্তিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, দাজ্জালের খোদায়ী মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করা।

৮) নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন করা। যেখানে দাজ্জাল থাকবে শাসক ও খোদা।

লকডাউনের উদ্দেশ্য নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা আপনাদেরকে দেয়ার চেষ্টা করলাম।

তবে দাজ্জালি বাহিনীর আরো বিভিন্ন গোপন এজেন্ডা সম্পর্কে জানতে চাইলে রূহ ভাইয়ের আর্মি অফ দাজ্জাল বইটি পড়তে পারেন। অনলাইনে ৪ খন্ড (পিডিএফ) আছে। ভবিষতে এগুলোরও নাকি হার্ড কপি বের হবে বলে শুনেছি।

হার্ড কপি বের হলে তো খুব ভালো। নাহলেও সমস্যা নেই। যেহেতু পিডিএফ আছে, সেখান থেকেও আপনারা পড়ে নিতে পারবেন। আর আমি (আনাস) আপনাদেরকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করবো রূহ ভাইয়ের বই গুলো পড়ার জন্য।

এতে আমার পরবর্তী আলোচনা গুলো বুঝতেও আপনাদের জন্য খুব সহজ হবে। কারণ পরের টপিক্সটি থাকছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সম্ভাব্য রূপরেখা সম্পর্কে।

দাজ্জালি ফেতনায় ঈমান বাঁচাতে পারবো তো?

এমনিতেই মুমিনের জন্য দুনিয়া একটি কারাগার তার উপরে আমরা আছি শেষ জমানায়। সুতরাং, কোনো সন্দেহ নেই যে, খুবই ভয়ংকর একসময়ে আছি আমরা। আবার বেশির ভাগ স্কলারদের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সময়টিও খুব কাছে। আর দাজ্জাল কোনো কাল্পনিক দানবও নয়। এটা মুমিনদের জন্য চরম এক পরীক্ষার নাম। মহাফেতনার অপর নাম। সকল নবী রাসূল তার নিজ নিজ উম্মাহকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। সাহাবীরাও দাজ্জালের কথা শুনে ভয় পেয়ে যেতেন। আর সেই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের কাছাকাছি সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি। হাদিস অনুযায়ী আমরা জানতে পারি অধিকংশ মানুষই দাজ্জালের ধোঁকায় পড়ে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে। বর্তমান সমাজের দিকে একটু গভীর দৃষ্টিপাত করলে ব্যাপারটা খুব ভালো করেই বুঝা যায়। আমাদের আশেপাশের মানুষ গুলোর দিকে প্রকৃত ইসলামের বা তাকওয়ার চশমা পড়ে তাকালে, দেখা যায় তারা মানুষের চামড়ার নিচে অন্য কোনো প্রাণী। মনুষত্ব তাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছে।

এই মানবতাহীন সমাজে, ফেতনার সাগরে, স্রোতের বিপরীতে চলাটা তো এমনিতেই একজন মুমিনের জন্য খুব কষ্টকর। তার উপর আবার যোগ হয়েছে করোনা ও লকডাউন নামে নতুন দুটি ম্যান মেড ফেতনা। তবে অবশ্যই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আজাব। ম্যান মেড হোক, আর প্রাকৃতিক হোক। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না। আর আল্লাহ কোনো আজাব এমনি এমনি দেন না। সব কিছু আমাদেরই হাতের কামাই। আমাদেরই কর্মফল।

আজ আমরা সবাই ভুক্তভোগী। সবাই হয়রানির শিকার হচ্ছি। করোনার বিষয়টা যেহেতু আমি প্রথম থেকেই সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষন করছি, তাই আমার কাছে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়। আমি তো আর মিডিয়ার উপর বিশ্বাস করিনা যে, অন্যদের মতো চিলের পিছনে দৌড়াবো আর কান খুঁজবো। 2020 এর মার্চ মাসে যখন আমাদের দেশে প্রথম লকডাউন দেয়া হয়েছিল, তখন আমি খেয়াল করেছি, ঠিক অফিসে যাওয়ার সময় (সকাল ছয়টা -সকাল আটটা) বৃষ্টি হয়। আবার ঠিক অফিস থেকে ছুটির সময় (বিকাল পাঁচটা - সন্ধ্যা সাতটা) বৃষ্টি হয়।

বিষয়টাকে অতটা গুরুত্ব দেইনি। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয় বলেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু যখন এটা রেগুলার ঠিক একই সময়ে ঘটেছিলো তখন কিছুটা সন্দেহ হলো। আর এই সন্দেহ আরো মজবুত হলো, যেদিন দেখলাম আমাদের আকাশে একটি বিমান ধুয়া ছড়াচ্ছে। এটাকে সাধারণত মানুষ বোয়িং বিমানের গ্যাস বা তার কারণে সৃষ্ট জলীয় বাস্প মনে করে।

আকাশে বিমান যাবার পর পেছন দিকে যে সাদা ধোয়ার মতন দেখা যায় তাকে বলে " কনট্রেইল"। এটা শুধু জলীয়বাষ্প।

জেট বিমানের ইঞ্জিন থেকে নির্গত উচ্চ তাপমাত্রার এক্সস্টে উপজাত হিসেবে বাষ্পীয় পানি, কার্বন কণা সহ অন্যান্য কিছু রাসায়নিক থাকে যা খুবই উষ্ণ ও আদ্র অবস্থায় যখন ৩৫/৪০ হাজার ফুট উপরের তীব্র ঠান্ডা বায়ুমন্ডলে (-৪০°c) নির্গত হয়, সাথে সাথেই বরফ কেলাসে পরিণত হয়ে যায় এবং ঘনীভবনের ফলে কার্বন কণাগুলোর আশেপাশে জমতে থাকে যার ফলে এভাবে সারা পথ জুড়ে জেট বিমান তার গতিপথের চিহ্ন রেখে যায় যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের মতো এই শুভ্র রেখা সৃষ্টি করে। তাই এই রেখা গুলোকে Contrail বলা হয়; Condensation (ঘনীভবন) এবং Trail (লেজ) এই দুটি শব্দ থেকে Contrail শব্দের উৎপত্তি।

কিন্তু পৃথিবীতে আরেকটি মারাত্বক অস্ত্র আছে, যার নাম "কেমট্রেইল"। কেমট্রেইলও দেখতে প্রায় একই রকম এবং এটাও প্লেনের মাধ্যমে একইভাবে আকাশে স্প্রে করা হয়। আর কেমট্রেইলে থাকে নানান রকম রাসায়নিক পদার্থ যা মানব সমাজে ক্যান্সার সহ আরো বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিতে পারে।

আবার এই কেমট্রেইল, হার্প ও ক্লাউড সিডিং এর দ্বারা কৃত্তিম বৃষ্টিও নামানো যায়। হার্প এবং ক্লাউড সিডিং এর ব্যাপারে নিশ্চই আপনারা জানেন। তবুও সংক্ষেপে একটু ধারণা দিচ্ছি।

জলবায়ু নিয়ন্ত্রনের একটি উপায় হলো "ক্লাউড সিডিং"। এখানে চার্জড আয়োনিক মলিকিউল কে ব্যাবহার করা হয় প্লেনের মাধ্যমে। এটা দ্বারা এক স্থানের মেঘ কে অন্য স্থানে সরিয়ে তা থেকে বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করা হবে বা হয় বলে জানা যায়। গালফ্ কান্ট্রিতে এই প্রযুক্তি ব্যাবহারের কথা জানা যায়। যেখানে বৃষ্টি দরকার সেখানে নেগেটিভ চার্জ ব্যাবহার করে আশপাশের মেঘকে টেনে আনা হয় এবং যেখানে খরা দরকার সেখানে পজেটিভ আয়ন ব্যাবহার করে সেখানকার মেঘকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।

High-Frequency Active Auroral Research প্রোগ্রাম (HAARP)। ওয়েদার ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র এই হার্প। এতে থাকা এলুমিমিয়াম এন্টেনা থেকে পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ার বা আয়ন মন্ডলে ফ্রিকুয়েন্সি বা তরঙ্গ প্রেরন করা হয়। এরপর এক জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা দ্বারা ঝড় সৃষ্টি করা হয়। এই হার্প ভূগর্ভে চৌম্বকীয় তরঙ্গ প্রেরন করে টেকটনিক প্লেটে ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে ভূকম্পন এবং সুনামি সৃষ্টিতে সক্ষম। হার্পের বেশ কিছু শাখা সারা দুনিয়া জুড়ে রয়েছে যার একটি শাখা আছে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে।

ধারনা করা হয় আমেরিকা তে হওয়া হ্যারিকেন ক্যাটরিনা এই হার্পের ফসল। ২০১৭ সালে আমেরিকায় হওয়া হ্যারিকেন হার্ভে এবং ইর্মা যে এই হার্পের পরীক্ষার ফসল তা ভুল করে ফক্স নিউজের সংবাদপাঠিকা বলে ফেলে।

তো সময় মতো বৃষ্টি, আবার আকাশে বিমান থেকে ধোয়া, এসব থেকে আমার মনে হলো উপরোক্ত দাজ্জালি প্রযুক্তির দ্বারাই বৃষ্টি নামানো হচ্ছে বা জীবাণু ছড়ানো হচ্ছে। আর এর দলিল ওতো আমাদের কাছে আছে। দাজ্জালের নির্দেশে মেঘ বৃষ্টি দিবে।

হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে দিচ্ছি।

[দাজ্জাল এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে নিজেকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার দাবি জানাবে। তারা দাজ্জালকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিবে এবং দাজ্জালের কথাকে তারা বিশ্বাস করবে। **ফলে দাজ্জাল তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আকাশকে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে নির্দেশ দিবে। ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে।**

ভূমিকে নির্দেশ দিবে ফসল উৎপন্ন করতে। ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে। সন্ধ্যাবেলা যখন তাদের গরু ছাগলগুলো মাঠ থেকে ফিরে আসবে তখন স্তনগুলো দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। উদর স্ফীত থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে এবং নিজেকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিতে তাদের নিকট দাবি জানাবে। তারা তাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করবে না। দাজ্জাল তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। তাদের কোনো ধন-সম্পদই অবশিষ্ট থাকবে না। সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে। দাজ্জাল এক অনুর্বর ভূমির পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। এ সময় ভূমিকে আদেশ করবে, তুমি তোমর গর্ভস্থ রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দাও।

ফলে ওই ভূমির সকল রত্নভাণ্ডার বেরিয়ে এসে দাজ্জালের পিছনে পিছনে এমনভাবে চলতে থাকবে যেরূপ মৌমাছিরা তাদের রাণী মাছির পেছনে পেছনে দল বেঁধে চলতে থাকে। (সংক্ষেপিত) । (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৯৩৭)]

হয়তোবা তারা চাচ্ছে অফিসে যাওয়ার সময় মানুষকে ভিজিয়ে দিতে। এতে মানুষের জ্বর, সর্দি, কাশির হার বৃদ্ধি পাবে। ফলে সেটাকে করোনা বলে চালানো যাবে। বা কেমট্রেইলের দ্বারা করোনার জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ ইনফেক্টেড হয়েছে। আর তাছাড়া মানুষের অতি সচেতনতার (over use of mask, PPE, face shield, sanitizer, etc.) কারণে ঘেমে ভিজে অনেকেই এমনিতেই অসুস্থ হয়েছে।

২০২০ এ না হলেও তার প্রভাব আমরা ২০২১ এ দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু আমার হাতে পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করার মতো কোনো উপাদান বা সুযোগ কোনোটাই নেই, তাই খুব দৃঢ়তার সাথে আমি বলতে পারছিনা যে, এগুলো কেমট্রেইলের মাধ্যমেই হচ্ছে। তবে দীর্ঘ পড়াশুনা আর গবেষণা থেকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে আমার কাছে এমনটাই মনে হচ্ছে। বাকি আল্লাহু আলম। তবে দাজ্জালের কারিশমা সম্পর্কিত হাদীসটিতে যা বলা হয়েছে, তার বেশিরভাগই হবে কালো জাদু এবং অপবিজ্ঞান ও অপপ্রযুক্তির সংমিশ্রনে।

যেমন বৃষ্টি নামানো হবে, ক্লাউড সিডিং এর দ্বারা। অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হবে জি এম ও (জেনেটিকালি মোডিফাইড) ফুড এর দ্বারা। পশুকেও এই পদ্ধতিতে মোটা তাজা করা হবে এবং তাদের স্তন গুলো দুধে পরিপূর্ণ করা হবে। গুপ্তধনকে উঠানো হবে মাইনিং (খনন) এর দ্বারা। দুর্ভিক্ষ, খরা, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি সৃষ্টি করা হবে হার্পের দ্বারা। রোগ জীবাণু ছড়ানো হবে কেমট্রেইলের দ্বারা। অর্থনৈতিক অবরোধ করা হবে, ব্যাংক একাউন্ট কে ফ্রিজ করার দ্বারা। সবকিছুই প্রযুক্তির দ্বারা হবে। যেগুলোর পূজা করছে বর্তমানের সকল মানুষ।

এ প্রযুক্তি গুলো এখন রীতিমতো ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেছে। সামনে আসছে মানুষকে জীবিত বা ক্লোন করার প্রযুক্তি। দাজ্জালের বাহিনী এসব নিয়েই কাজ করছে। তবে দাজ্জালের বাহিনী মারাত্মক একটি খেলা খেলছে এই করোনা আর লকডাউন দিয়ে। প্রত্যেকটা মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে। এই এক বছর আমি নিজেই কতরকম পেরেশানির শিকার হয়েছি।

কারো একটু জ্বর, সর্দি, হাঁচি, কাশি হলেই মানুষ তাকে ভয় পাচ্ছে, ঘৃণা করছে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। অযত্ন অবহেলায় ওই মানুষটা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পর্যাপ্ত সেবা যত্ন না পেয়ে আর মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ মেশ মারাই যাচ্ছে। এবং সকল মৃত্যুকে করোনা মৃত্যু বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও করোনা আসার পর অন্য সকল রোগ পৃথিবী থেকে বিদায় নিছে। যে যেভাবেই মরুক না কেন, সবই করোনা বলে চালানো হচ্ছে। আর মানুষ ভয়ে আতংকে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় কাউকে মাস্ক ছাড়া পেলে তাকে যেন পিটিয়েই মেরে ফেলবে, এমন একটা অবস্থা। বা কেউ একটা হাঁচি দিলে, সে যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে।

কারো একটু জ্বর হলেই সেটাকে করোনা বলে চালিয়ে তাকে পেরেশান করা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি কম বেশি সবাই ফেস করছে। আমিও বাদ যাইনি।

এরপর তো আরেক ফেতনা হাজির হয় ভ্যাকসিনের নামে। মানুষকে যেভাবে ভয় লাগানো হয়েছে, মানুষ এমনিতেই ভ্যাকসিনের জন্য পাগল হয়ে গেছে। প্রথমে কিছুটা শিথিল হলেও, এখন তো একদম বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। সুস্থ মানুষদেরকেও টিকা নিতে হবে। কি আশ্চর্য, যেই মানুষটার কোনো রোগ নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ, তাকেও নাকি টিকা নিতে হবে। এখন হয়তো কেউ কেউ বলবেন, টিকা তো প্রতিরোধক হিসেবে নেয়া হয়। যেনো ভবিষ্যতে ওই রোগ না হয়।

এমন হলে তো হাজার হাজার টিকা নিতে হবে। মানুষের তো হাজার হাজার রোগ আছে। আবার ভবিষতেও নতুন নতুন রোগ হতে পারে। তাহলে ভবিষ্যৎ কাল্পনিক রোগের জন্যেও তো শত শত ভ্যাকসিন নিয়ে রাখতে হবে।

ভাই, ভ্যাকসিনটি আপনাকে সুস্থ করার জন্যে দেয়া হয়না। বরং আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি ভাবে অসুস্থ করে রাখার জন্যে দেয়া হয়। এখন হয়তো আপনি কিছুই টের পাবেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে এর প্রভাব আপনার উপর পড়বে। অবশ্য তখনও আপনি সেটা বুঝতে পারবেন না, কারণ সেটা কয়েক বছর পর আপনার শরীরে কাজ করা শুরু করবে। আর ততদিনে তো আপনি টিকার কথা ভুলেই যাবেন।

তো এমনটা করে কাফেরদের কি লাভ? অনেক লাভ। তারা আপনাকে দিয়ে ব্যবসা করবে। আপনি সারাজীবন অসুস্থ থাকবেন আর তাদের বানানো বিষ (ট্যাবলেট) খাবেন। আর এসব টিকা ও ঔষধের প্রভাবে আপনার শরীরের সাথে সাথে ঈমানী শক্তিও দুর্বল হতে থাকবে। দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা কমতে থাকবে। কাফেরদের তথা দাজ্জালি সংস্কৃতি গুলোই ভালো লাগবে। তিব্বে নববী বা সুন্নাহ চিকিৎসার কথাও ভুলে যাবেন। আপনার কষ্টার্জিত টাকা গুলো চিকিৎসার পিছনেই বেশি ব্যায় হবে। আর এলিটরা ফুলে ফেঁপে উঠবে এবং সেই টাকা দিয়ে জুন্দুল্লাহদেরকে দমন করবে। কারণ, তারা জানে যে, তাদের জন্য জুন্দুল্লাহরা ছাড়া আর কোনো মুসলিমই হুমকি নয়। জুন্দুল্লাহরাই হচ্ছে তাদের প্রভু দাজ্জালের সবচেয়ে বড় শত্রু।

প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার পথে মনে মনে এসব ভাবি। আর বাস্তবতার মিলিয়ে দেখি। সব মিলে যায়। অন্তর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে কোথাও প্রকৃত ইসলামকে দেখতে পাইনা। কোথাও প্রকৃত মুমিন বা মুত্তাকীকে দেখতে পাইনা। থাকবেই বা কিভাবে? মুত্তাকীরা তো রাস্তায় বের হয়না। হয় তারা ঘরে জমে গেছে, নয়তো লড়াই করতে চলে গেছে।

আফসোস লাগে নিজের জন্যে। এখনো এই দুর্গন্ধময় সমাজে পড়ে আছি নিরুপায় হয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ইয়াজুজ মাজুজ কি আরো পড়ে বের হবে? নাকি বের হয়ে সবাইকে ক্রমশ তাদের মতো বানিয়ে ফেলছে? মানুষের মধ্যে দরদ বা মানবতা গুলো প্রতিদিনই বিদায় নিচ্ছে। মানুষ গুলো কেমন যেন হিংস্র হয়ে যাচ্ছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। কেউ কাউকে মানছেনা। মনে হচ্ছে মানুষের চামড়ার নীচে বাস করছে অন্য কিছু। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে যা প্রচার করা হচ্ছে, মানুষ তাই অনুসরণ করছে। ৯৯ শতাংশ মানুষ আজ তাদের অনুসরণ করছে।

ভয় লাগে। খুব ভয় লাগে। বাঁচাতে পারবো তো নিজের ঈমানকে, এই ফেতনার সমাজে থেকে? শহরকে যেভাবে উন্নত করা হচ্ছে, আর নিয়ম কানুনের বেড়াজাল তৈরী করা হচ্ছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে যে এগুলো দাজ্জালের জান্নাতে পরিণত হবে। এবং সেখানে থাকতে হলে দাজ্জালের নিয়ম মেনেই থাকতে হবে। দাজ্জাল মানুষকে এতো সুযোগ সুবিধা দিবে, অর্থাৎ তার জান্নাতে আপনাকে থাকতে দিবে আর বিনিময়ে কিছুই নিবে না?? তাতো হবে না। আপনার ঈমানটা কেড়ে নিবে। আপনাকে সিজদা দিতে হবে দাজ্জালকে, নাউযুবিল্লাহ। আমাদের দেশে যেভাবে উন্নয়ন কাজ চলছে তাতে মনে হচ্ছে আগামী কয়েক বছর পর কিছু অংশ দাজ্জালের মিনি জান্নাতে পরিণত হবে। উন্নত দেশের কথা তো বাদই দিলাম। সেগুলো তো অনেক আগেই দাজ্জালের জান্নাত হয়ে গেছে। এখন আমাদের দেশটাও সেই পথে।

এসব নিয়ে প্রতিদিনই ভাবি। সামনে কিভাবে কি করবো? কিভাবে নিজের ঈমানকে বাঁচাবো? কিভাবে দাজ্জালের ভয়ংকর থাবা থেকে বাঁচবো?

আজকে রাস্তায় খুব জ্যাম। বাসায় ফিরতে রাত হয়ে গেলো। খুব ক্লান্ত লাগছে।

স্মার্ট পৃথিবী:

গোসল করে এশার নামাজ পড়ে নিজের বিছানায় বসে একটা কিতাব দেখতে লাগলাম।

==========

যেদিন আমার ফিরতে দেরি হয় বা বেশি ক্লান্ত থাকি সেদিন সময় পেলে একটু কিতাবে নজর বুলাই। ফোন হাতে নেই না। কারণ, চোখ ও মাথা ব্যাথা করে। প্রতিদিন এভাবেই কাটে আমার। অফিস আর ঘর। ঘর আর অফিস। ভালো লাগেনা। একই রকম জীবন। কোনো বৈচিত্রতা নেই। তবুও এই বেঁধে দেয়া জীবনেই চলতে হয়। এভাবে অনেক গুলো বছর কেটে গেছে।

আমাদের দেশ এখন অনেক উন্নত। মেট্রো রেল চলছে। আর্টিকুলেটেড বাস ছুটে যায় রাজপথ দিয়ে। আরো কিছু ইলেকট্রিক গাড়ি এসেছে। রাস্তার চেহারাই বদলে গেছে। ফ্লাইওভার দিয়ে পুরো শহর ভরে গেছে।

পার্সোনাল গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। পাবলিক গাড়িই বেশি। ভাড়া দেয়া হয় এপ্সের মাধ্যমে। বেশির ভাগ গাড়িতেই জিপিএস আছে। তাই ট্র্যাক করাও যায় অনায়াসে। জায়গায় জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। রাস্তার উপর মাঝে মাঝে কিছু মিলিটারি ড্রোনও দেখা যায়। এগুলো ট্রাফিক বিভাগ, টহলের কাজে ব্যবহার করে।

বেশির ভাগ অফিস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আই প্রিন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। শপিং মল তো বটেই ছোট ছোট মুদির দোকানেও পজ মেশিন আছে। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে পেমেন্ট হয়।

ক্যাশ লেনদেন প্রায় উঠেই গেছে। সমস্ত ফোন এবং সিম রেজিস্ট্রেশন করা। সবার উপর নজরদারি করা হয়।

সবার হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। ঘরে ঘরে স্মার্ট টেকনোলজি। স্মার্ট টিভি, স্মার্ট ফ্রিজ, ইত্যাদি। বেশিরভাগ কার্যক্রম অনলাইনেই হয়। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বেশি ব্যবহার হচ্ছে। ফলে মানুষ নিজের মেধা ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। যা প্রয়োজন গুগলকে কমান্ড দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।

শুনতে তো ভালোই লাগছে, তাইনা? কিন্তু এই সকল সুবিধা (?) তারাই পাচ্ছে, যারা ভ্যাকসিন নিয়েছে এবং দাজ্জালি সকল নিয়ম কানুন মেনে নিয়েছে। ধনীরা সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। গরিবরা তো বলতে গেলে জীবিত লাশ। আর মধ্যবিত্তরা কোনোরকম বেঁচে আছে। মুমিন বা মুত্তাকীদের জন্য হয়ে উঠেছে জাহান্নাম।

মানুষ অনেক অলস হয়ে গেছে। তারা ভার্চুয়াল জগতেই বেশি সময় কাটায়। সেখানে প্রত্যেকেই নিজেদের একটা জগৎ গড়ে নিয়েছে। বাস্তব জীবনে কেউই সুখী নয়। তাই তারা ভার্চুয়াল লাইফে সুখ খুঁজে ফিরে। বাস্তবের সম্পর্ক গুলো একদম মলিন হয়ে গেছে। একইসাথে থাকে, কিন্তু কেউ কারো খবর রাখেনা। বিয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গেছে। অন্য উপায়ে জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণ করে নেয়। অনেকের আবার বিভিন্ন ভ্যাকসিনের প্রভাবে আবেগ অনুভূতি একেবারেই বিদায় নিয়েছে। এরা হয়ে উঠেছে মানুষরূপী রোবট।

ওসব টিকার কারণে যে শুধু আবেগ বিদায় নিয়েছে, তা নয়। পাশাপাশি আরো অনেক নতুন নতুন রোগও মানুষের শরীরে বাসা বেঁধেছে (যদিও তারা বুঝতে পারছেনা যে, এগুলো ঐসব টিকারই ফসল) । ফলে সবাইকেই ঔষধের একটি ব্যাগ সবসময়েই সাথে রাখতে হয়। অবশ্য এখানে চক্রান্তকারীরা একটা খেলা খেলেছে।

তারা এটাকে ট্রেন্ড ও ফ্যাশন হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। তাই সবাই একটা স্মার্ট মেডিসিন বক্স সাথে রাখতে বেশ সাচ্ছন্দ বোধ করে।

জনগণ এই সাধারণ জিনিসটা বুঝলো না যে, যেখানে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, সেখানে কিনা মানুষকে টিকা দিয়ে বাঁচানোর ফিকির করছে তারা?? ওরা তো চায় এই টিকা দিয়ে নগদ ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা করতে।

টিকার ব্যাপারে যদি আপনারা আরো বেশি জানতে চান, তাহলে আর্মি অফ দাজ্জাল কিতাবটা পড়ে নিয়েন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন অনেক বেশি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন গেজেট বের হচ্ছে। যা মানুষের (দাজ্জালের দাস) জীবনকে স্বাচ্ছন্দময় (দাজ্জালের জান্নাত) করে তুলছে।

যারা একটু বেশি সচ্ছল, তারা আবার ঘরে রোবট রাখে। রোবট তাদের কাজ করে দেয়। কর্পোরেট অফিসগুলোতেও রোবটের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। রেস্টুরেন্ট, হাসপাতাল ও ফ্যাক্টরিতে ভারী ভারী কাজের জন্য রোবট রাখা হয়েছে। কিছু কিছু দামি হাসপাতালে রোবট দিয়ে অস্ত্রপ্রচার হয়।

জুম মিটিংয়ের জায়গা দখল করেছে "হলো মিটিং"। অর্থাৎ, আপনার রুমে আপনি একা থাকলেও মিটিংয়ের অন্যান্য সদস্যরা ভার্চুয়ালি আপনার রুমে উপস্থিত থাকবে। মানে তাদের একটা হলোগ্রাফিক অবয়ব আপনার সামনে থাকবে। মনে হবে ওই ব্যাক্তিটাই আপনার সামনে বসে আছে।

অনেকে আবার স্মার্ট চশমাও ব্যবহার করছে। স্মার্ট ঘড়ি আর মোবাইল তো আগে থেকেই আছে। এখন যোগ হয়েছে স্মার্ট আই গ্লাস। এগুলো সবই একটার সাথে আরেকটা সিঙ্ক্রোনাইজ করা। একটার কাজ আরেকটা দিয়ে করা যায়। অর্থাৎ মোবাইলে ফোন আসলে আপনার ঘড়ি এবং চশমায়ও দেখতে পারবেন। মোবাইলের স্ক্রিনে যা দেখা যায়, সবই আপনি আপনার চশমা দিয়ে দেখতে পারবেন।

আমি শুধু বাংলাদেশের কথা বলছি। তাও আবার কিছু শহরের। পুরো দেশের নয়। অন্যান্য অঞ্চলের কথা পরে বলছি। আর উন্নত বা ধনী দেশ গুলোর কথা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। সেগুলো যেন এককেটা (দাজ্জালের) জান্নাত। সকল সুযোগ সুবিধাই সেখানে আছে। আমি তো সেখানে যাইনি, তাই হুবহু বর্ণনা করতে পারছিনা। মোবাইলে বা পত্রিকায় যা দেখি বা পড়ি তাই জানি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন্ধু বা আত্মীয়দের থেকে জানতে পারি, যারা ঐসব দেশে থাকে।

তবে আপনারা তো অবশ্যই ধারণা করতে পারছেন যে, সেখানে কি অবস্থা? যেহেতু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এতো কিছু হচ্ছে। সেহেতু উন্নত দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে (কালো জাদুর ফসল) আরো এগিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে হা, গরিব রাষ্ট্র গুলো কিন্তু এই সুবিধা পাচ্ছেনা। তারা আগের মতোই দরিদ্র ও অনুন্নত রয়ে গেছে।

আলট্রা স্মার্ট সিটি:

আরো কয়েক বছর পর।

ভেন্ডিং মেশিন:

ভেন্ডিং মেশিন (ফ্রিজের মতো দেখতে একটি মেশিন এটি। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য নিজেই নিয়ে নিতে পারবেন) তো অনেক আগেই এসেছে। এখন সেগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো সব জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে।

কৃত্তিম বৃষ্টিপাত:

বাংলাদেশ এখন আরো বেশি উন্নত। কিছুদিন আগেও যেসব প্রযুক্তি উন্নত দেশে ব্যবহার হতো সেসব এখন আমাদের দেশেও ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন কৃত্তিম বৃষ্টিপাত। বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলে যদি বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহলে ড্রোন, হার্প ও কেমট্রেইলের দ্বারা বৃষ্টি নামিয়ে নেয়। তবে হা, এটার জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে আমাদের দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরকে অনুমতি নিতে হয়।

ট্রান্সহিউম্যান ও ট্রান্সজেন্ডার:

একদিন একটি অভিজাত এলাকায় দেখি একটা লোক, তার শরীরের বেশিরভাগ অংশই বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা পূর্ণ। আরেকদিন দেখি অদ্ভুত একটা মানুষ। হিজড়াদের মতোই, কিন্তু হিজড়া নয়। পরে বুঝলাম বাংলাদেশে ট্রান্সহিউম্যান (অর্ধ মানব অর্ধ রোবট) আর ট্রান্সজেন্ডার (নারী পুরুষের কৃত্তিম মিশ্রণ) কালচার এসে গেছে।

রাস্তায় মাঝে মাঝেই এরকম কিছু ট্রান্সহিউম্যান ও ট্রান্সজেন্ডার দেখা যায়। এখন যদিও মানুষ তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকায়, কিন্তু কিছুদিন পর সবাই অভ্যস্থ হয়ে যাবে।

কারণ এ দুটো জিনিসকে চিকিৎসা (অপ) বিজ্ঞানের বিশাল সাফল্য হিসেবে দেখানো হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে এটা উন্নয়ন মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টির চরম বিকৃতি। ট্রান্সহিউম্যানিজম শর্ত সাপেক্ষে কিছু মানুষের (পঙ্গু বা অন্য কোনো সমস্যাগ্রস্ত) ক্ষেত্রে কোনো ভাবে মেনে নেয়া গেলেও, ট্রান্সজেন্ডারকে তো একদমই মানা যায়না। কারণ এ পক্রিয়ায় একদম সুস্থ একজন পুরুষ অপচিকিৎসার দ্বারা নিজেকে মেয়ে বানিয়ে ফেলছে। আবার নারী নিজেকে পুরুষ বানিয়ে নিচ্ছে।

নিউরালিংক চিপ:

এবার শুনুন স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। বাচ্চারা এখন আর ভারী ভারী ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যায়না। একটা বড় টেবলেট বা নোটপ্যাড নিয়ে স্কুলে যায়। কলেজ ভার্সিটিতেও একই অবস্থা। সব স্টুডেন্টদের কাছে একটি করে আই-প্যাড আছে। পড়াশুনা সেখানেই হয়। শিক্ষকরাও এখন আর ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে পড়ান না। স্মার্ট বোর্ডে পড়ান। কারো কিছু (বই, লেকচার বা এসাইনমেন্ট) লাগলে সেখান থেকে ছাত্রের আই-প্যাডে সেন্ড করে দেন।

কিছু কিছু হাই ক্লাস ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আবার নিউরালিংক চিপ ব্যবহার করে। এটা ছাত্রের মাথায় ব্রেইনের সাথে এটাচ থাকে। প্রয়োজন মতো সিলেবাস বা বই সেখানে ইনস্টল করা যায়।

কিছু হাসপাতাল এবং সামরিক বাহিনীতেও এই নিউরালিঙ্ক চিপ ব্যবহার হচ্ছে। কখনো যাদের ব্রেইন একেবারে ড্যামেজ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে, আবার কখনো সৈন্যের যুদ্ধক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার জন্য।

এই দুই ক্ষেত্রে ট্রান্সহিউম্যানিজম প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা নিজেদের অঙ্গ হারিয়েছে যুদ্ধে বা অন্য কোনো কারণে, তাদের শরীরে রোবট বসিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে এগুলো অত্যন্ত ব্যায়বহুল। সবাই এ সুবিধা পায়না। ব্যাক্তিগতভাবে শুধুমাত্র উচ্চবিত্তরাই এসব পায়। আর বিশেষ বিশেষ সৈন্যদের উপর যেটা প্রয়োগ করা হয়, সেটা তো সরকারিভাবেই হয়।

ট্রান্সহিউম্যানিজমের দ্বারা অনেকেই অমরত্ব লাভের স্বপ্ন দেখছে। আসলে দাজ্জাল তাদেরকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছে। জান্নাতে যেমন মানুষ মারা যাবেনা। তেমনি দাজ্জালের জান্নাতেও মানুষকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখা হবে এই পদ্ধতিতে। কেউ যদি মারাও যায় তবু তার মেমোরিকে চিপে ঢুকিয়ে কোনো একটা রোবটের মধ্যে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

আবার যে জিন বা টিস্যুর কারণে আমাদের বয়স বেড়ে যায়, সেই জিনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই গবেষণা করে যাচ্ছেন গবেষকরা। এই গবেষণার ফল হয়তো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রায় ১০০ বছর অথবা তার বেশি সময় বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে।

জিন সম্পাদনা করে ‘আদর্শ’ মানুষ তৈরি করার বিদ্যা মানুষ আগামী কিছু বছরের মধ্যে খুব ভালোভাবেই রপ্ত করবে। আগামী দশকগুলোতে (অপ) বিজ্ঞানীরা আশা করছেন কম্পিউটারে মানব মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপন করতে সফল হবেন তারা। এর মাধ্যমে আজীবনের জন্য কৃত্রিম শরীরের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ, পূর্ণ হবে অমরত্বের স্বপ্ন!

রাশিয়ান ধনকুবের দিমিত্রি ইসকোভের অর্থায়নে নিউরোসাইন্টিস্ট র‍্যাপন্ডাল কোয়েন চেষ্টা করছেন মানব চেতনা ও মস্তিষ্ককে যেন আগামী ২০৪৫ সালের মধ্যে কৃত্রিম শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়। এমনকি এখন যারা বেঁচে আছেন তারা মারা গেলেও এক সময় নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে তারা বেঁচে উঠবেন, কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত নিজেদের মস্তিষ্কের সাহায্যে। এমন আশার কথা শোনাচ্ছেন (অপ) বিজ্ঞানীরা। এজন্য (অপ) বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণা করছেন কেমিক্যাল সলুশনের মাধ্যমে কিভাবে মস্তিষ্ককে অনন্তকাল সতেজ রাখা যায়।

আসলে এগুলো সবই ধোঁকা। মানুষ কখনোই অমরত্ব লাভ করতে পারবে না। সর্বোচ্চ হয়তো ওই মৃত মানুষের কারিন জীন রোবোটটিতে প্রবেশ করে ওই মানুষের মতো কথা বলবে বা আচরণ করবে। এতে মানুষ মনে করবে ওই মানুষটা ফিরে এসেছে বা বেঁচে আছে। এই ধোঁকা গুলো সবাই ধরতে পারবেনা। একমাত্র মুত্তাকী মুমিনরাই বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

আরো কয়েক বছর পর।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলি স্থান অনুসন্ধানে, কার্যকর ঔষধ ও রোগ নির্ণয়ে রাখছে কার্যকর ভূমিকা। এই সুপারফাস্ট ও বুদ্ধিমান কম্পিউটার নিজেই মোটর গাড়ি চালাতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে উৎপাদনে রোবটের ব্যবহার এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছে যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর সম্পদের ফারাক সাত আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। উন্নত দেশগুলোর ত্রুটিহীন মানবজিনোমের অধিকারী বড়লোকেরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে না।

এরা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়ে প্রথমে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পানিসীমানায় নিজস্ব কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে বড়লোকপাড়া স্থাপন করেছে। সেখানে জান্নাতি জীবন যাপন করছে।

যানবাহনের জন্য কোনো ড্রাইভারের প্রয়োজন হচ্ছে না। মিলকেন ইন্সটিটিউটের তথ্য মোতাবেক আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সব গাড়ি হবে চালকমুক্ত। মানবীয় ভুলের সম্ভাবনা না থাকায় এই সব চালকবিহীন গাড়ি হবে বেশি নিরাপদ। এছাড়াও সারা বিশ্বে বৈদ্যুতিক গাড়ির জয়জয়কার হবে।

বাংলাদেশ পুরোপুরি এমন হতে না পারলেও, গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর অদূরে এরকম কিছু মডেল টাউন গড়ে উঠছে। সেখানের অধিবাসীরা অনেকটা উন্নত দেশের মতোই জান্নাতি (দাজ্জালের) জীবন যাপন করছে। এগুলোতো তারাই পাচ্ছে, যারা পরিপূর্ণ রূপে দাজ্জালের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। অবশ্য তাদের কাছে এটাই আধুনিকতা। এটা যে দাজ্জালের জান্নাত, সেটা তারা বুঝতে পারছেনা। অন্যান্য সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেনা। বরং, তারাও এমন জীবন পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থ্যাৎ দাজ্জালের জান্নাতে ঢুকার জন্য পরিশ্রম করছে প্রতিদিন। কিন্তু সবার ভাগ্যে তো আর তা জুটেনা। অন্যদিকে মুত্তাকী মুমিনরা ঠিকই দাজ্জালের জান্নাতকে চিনে নিয়েছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা খুব নগন্য। অধিকাংশ মানুষ (৯৯%) দাজ্জালের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে।

ভ্যাকসিন আপডেশন:

করোনার নাটক করে মানুষকে যে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছিল। সেটা এখন প্রতিবছর আপডেট করতে হয়। আর এর জন্য সবার শরীরেই একটা করে মাইক্রোচিপ ঢুকানো আছে। এন্ড্রয়েডের মতো আপডেট করে নিতে হয়। এছাড়াও এই চিপের আরো অনেকগুলো কাজ আছে। এই একটা চিপ দিয়েই পাসপোর্ট, লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, পরিচয়পত্র, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন সেবা পাওয়া যায়।

টেলিপ্যাড:

এই দশকের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে টেলিপ্যাড। এতদিন মেইল, ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্ট ইত্যাদি মুহূর্তের মধ্যে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন দেখছি, একটা বস্তুকেই টেলিপোর্ট করে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে মুহূর্তের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ঠিক মেইল ও ভিডিওর মতো। যেই জিনিসটার মাধ্যমে এটা করা হয়, সেটার নাম টেলিপ্যাড। গোল রিং এর মতো একটা মেশিন। সেখানে কোনো বস্তু রেখে এড্রেস লিখে সেন্ড করলেই কাঙ্খিত স্থানে চলে যায়। আমাদের দেশে অবশ্য এভেইলেবল হয়নি এখনো। বড় বড় কিছু প্রাইভেট কোম্পানি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে আর কয়েক বছর পর সব প্রতিষ্ঠানে চলে আসবে বলে মনে হচ্ছে। এই টেলিপ্যাড মেশিনটি দিয়ে কেউ কেউ আবার টাইম ট্রাভলও করার চেষ্টা করছে।

এবার আপনাদেরকে আমি (আনাস) এই টেলিপোর্টেশনের পুরো রহস্যটা বলছি। আমরা জানি জিনেরা অদৃশ্য হতে পারে। এবং মুহূর্তের মধ্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। আর এই ব্যাপারটাই এখানে এপ্লাই করা হয়েছে।

জিনদের এই টেলিপোর্টেশনের ক্ষমতাকেই মেশিনের মধ্যে ডাইভার্ট করা হয়েছে। আবার এখানে সরাসরি জিনের হস্তক্ষেপও থাকতে পারে। হয়তো জীনেরাই ওই বস্তুগুলোকে চোখের পলকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। ঠিক যেমনটা হয়েছিল সুলাইমান (আ:) এর জমানায়। রানী বিলকিসের সিংহাসনটা তো একটা জীনই মুহূর্তের মধ্যে এনে দিয়েছিলো। তাইনা? একই ভাবে অর্থাৎ জিনের সহযোগিতায় টাইম ট্রাভেলও করা সম্ভব। তবে সেটা সর্বোচ্চ একদিনের জন্য। জিন আপনাকে সর্বোচ্চ একদিন আগে বা পিছে নিয়ে যেতে পারবে। এর বেশি নয়।

অবাক হলেন নাকি??

অবাক হওয়ার কিছু নেই। ব্যাপারটা খুবই সহজ। একটা জীন যদি একটা মানুষকে কোনো একদিন পৃথিবীর একদম পূর্ব থেকে পশ্চিমে চোখের পলকে নিয়ে যায়, তাহলে সে একদিন পিছিয়ে যাবে। কারণ ঐদিন একদম পূর্ব প্রান্তে যদি ২ তারিখ হয়, তাহলে পশ্চিমে হবে ১ তারিখ।

একইভাবে পৃথিবীর একদম পশ্চিম থেকে পূর্বে যদি চোখের পলকে নিয়ে যায়, তাহলে সে একদিন এগিয়ে যাবে। কারণ ঐদিন একদম পশ্চিম প্রান্তে যদি ১ তারিখ হয়, তাহলে পূর্ব প্রান্তে হবে ২ তারিখ। অতএব বুঝা গেলো এই পৃথিবীর ভিতরে থেকেই সর্বোচ্চ এক দিনের জন্য টাইম ট্রাভেল করা সম্ভব। পৃথিবীর বাহিরে বা শত বছরের জন্য সম্ভব নয়, যেমনটা অপবিজ্ঞানীরা বলে থাকে।

তো এই হচ্ছে টাইম মেশিন বা টেলিপ্যাডের রহস্য। কিন্তু মানুষতো এগুলোকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার মনে করে অপবিজ্ঞানের (মূলত দাজ্জালের) পূজা করছে।

আর বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় যেসব ডিভাইস বা গেজেট বের হচ্ছে, সবগুলোতেই এ আই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স) প্রযুক্তি ইনক্লুইড করা আছে। এগুলো মানুষের ইমোশন বুঝতে পারে। ফেস রিকোগনিশনের দ্বারা মানুষের আবেগ বুঝে নিয়ে ডিভাইস গুলো সেভাবেই ট্রিট করে। অর্থাৎ আপনার যদি মন খারাপ থাকে তাহলে আপনার মোবাইলটি তার ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে আপনার চেহারা দেখে বুঝে নিবে এবং আপনার মন ভালো করার জন্য নিজে থেকেই ফানি কন্টেন্ট শো করবে। অথবা আপনাকে কৌতুক শুনাবে। বা অন্য যে কোনো উপায়ে আপনার মন ভালো করার চেষ্টা করবে। এরকম ভাবে আপনার প্রত্যেকটা ইমোশনকে সে রিড করবে এবং আপনার সাথে সেরকমই আচরণ করবে।

আসল কথা হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে প্রতিদিন নিত্য নতুন যেসব ডিভাইস বা গেজেট আসছে, সেগুলো সবই জিনদের কাছে আছে। আমাদের অপবিজ্ঞানীরা (কালো জাদুকর) জীন শয়তানের পূজা করে, ওদের কাছ থেকে এসব প্রযুক্তি ভিক্ষা নেয়। আর সাধারণ মানুষেরা আবার এসব অপবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানীদের পূজা করে।

আর এসব ডিভাইস গুলোর ভিতরেও হয়তো জিনদের একটা বাহিনী থাকে। যারা মানুষের ইমোশনকে বুঝে ডিভাইসের মাধ্যমে তাকে বিনোদন দেয়। আর অপবিজ্ঞানীরা এটার নাম দিয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স। কারণ, কোনো জড়ো বস্তু কখনোই মানুষের আবেগ বুঝতে পারবেনা। অবশ্যই সেখানে প্রাণ থাকতে হবে। আর এই প্রাণটাই হচ্ছে ছোট ছোট জীন। ‘‘ইনসাইড আউট’’ নামে একটা এনিমেটেড মুভি আছে, সেখানে এই বিষয়টা দেখানো হয়েছে।

তবে এসব ডিভাইসের একটা খারাপ দিক হলো এগুলো হ্যাক করে পুরো মানুষটাকেই হ্যাক করে ফেলা যায়। এবং তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করানো যায়। আবার এক দেশের সন্ত্রাসীরা আরেক দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্লান্ট বা অফিস গুলো হ্যাক করে, সেটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। যেমন, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ অফিস, ট্রেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ তারা অন্য জায়গায় বসে এখানের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

জায়ান্ট সাপ্লায়ার:

আমাজন ও আলিবাবার মতো প্রতিষ্ঠান গুলো পুরো পৃথিবী দখল করে ফেলেছে। সারা বিশ্বে তারাই প্রোডাক্ট সাপ্লাই দেয়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনার কাছে পণ্য পৌঁছে দিবে। এক্ষেত্রে তারা ড্রোন ব্যবহার করছে, একদম আপনার ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এটা সাধারণদের জন্য। আর উচ্চবিত্তদের বাসায় টেলিপোর্ট করে দেয়।

মোট কথা পৃথিবীর একাংশকে দাজ্জালের বাহিনী, দাজ্জালের বান্দাদের জন্য জান্নাত বানিয়ে ফেলেছে। সামনে এ ব্যাপারে আরো কিছু আলোচনা আসছে। এটিলদের এলিট সিটি (আসগার্ডিয়া) নিয়ে। সাথে অন্যদিকের বিপর্যস্ত এক দুনিয়ার চিত্রও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে ইনশাআল্লাহ।

প্রযুক্তি ও আধুনিক সংস্কৃতির নামে কালো জাদুর চর্চা:

আমরা সবাই জানি কালো জাদুর চর্চা শুরু হয়েছিল হাজার বছর আগে হারুত মারুত নামক দুইজন ফেরেশতার জমানা থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে সেটা ছিল ইদ্রিস (আ:) এর জমানা। যদিও বেশিরভাগ মানুষ মনে করে ওটা সুলাইমান (আ:) এর সময়কাল ছিল। কিন্তু খুব ভালো করে খেলা করলে বুঝা যায় সেটা সুলাইমান (আ:) এর অনেক আগের ঘটনা।

আয়াত টি হলো:

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত।

তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। [সুরা বাকারা - ২:১০২]

জাদুবিদ্যার সূত্রপাত অনেক আগেই হয়েছে। কিন্তু শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে সুলাইমান (আ:) এর জমানায়। সে সময় জাদুবিদ্যার এতো ব্যাপক প্রচার প্রসার হয়েছে যে, অনেকেই জাদুবিদ্যা চর্চায় অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলো। এবং সমাজে এটা খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে মনে করতো সুলাইমানও (আ:) একজন জাদুকর, নাউযুবিল্লাহ। তাই আল্লাহ এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে, সুলাইমান (আ:) নয় বরং শয়তানরাই ছিল জাদুকর। তারাই (জীন শয়তান) মানুষকে কালো জাদু শিখাতো এবং কুফুরী করাতো। মানুষেরা, জাহান্নামের বিনিময়ে জীন শয়তানের সহযোগিতা নিয়ে কালো জাদুর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করতো। বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে গন্ডগোল সৃষ্টি করে দিতো। এতে শয়তান তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে দুনিয়াবী সফলতা দিতো। এই লোকগুলো তাদের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিতো। ফলে শয়তান তাদেরকে আরো কঠিন ও শক্তিশালী জাদু শিখাতো।

ওই সময় কালো জাদুর এই ফেতনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ফলে সুলাইমান (আ:) বাধ্য হয়ে সকল জাদু বিদ্যার বই বা উপাদান গুলো নিজের সিংহাসনের নিচে পুঁতে ফেলেছিলেন (এই বিষয়টা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে কিছুটা বিতর্ক আছে)। এবং অবাধ্য জিনদেরকে বন্দি করেছিলেন। তবে কিছু কিছু বই কিছু জাদুকরের কাছে রয়ে গিয়েছিলো। তারাও সুলাইমান (আ:) এর ভয়ে সেগুলো লুকিয়ে ফেলেছিলো। পরবর্তীতে উনার ইন্তেকালের অনেক পর ধীরে ধীরে আবার মানুষ কালো জাদুর চর্চা শুরু করে। এবং জাদুকরদের লুকিয়ে রাখা কিছু বই খুঁজে বের করে। সেখান থেকে অধ্যয়ণ করে সেই পুরোনো ডার্ক ম্যাজিকের প্রাকটিস শুরু করে। তারা আবারো ডার্ক লর্ড (অন্ধকারে রাজা / ইফরীত জীন / শয়তান) দেরকে আহব্বান করে মানুষের সমাজে ফিরিয়ে আনে।

তারা এসব কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে করতো বলে তাদেরকে সিক্রেট সোসাইটি বা গুপ্ত সংস্থা বলে ঢাকা হতো। ধীরে ধীরে এরকম অনেকগুলো নিষিদ্ধ সংগঠন লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে উঠে। যারা লুকিয়ে লুকিয়ে লুসিফারের (ইবলিশ) পূজা করে এবং কালো জাদুর চর্চা করে। এরকম কিছু শক্তিশালী সোসাইটি হলো ইলুমিনাতি, ফ্রিমেসন, স্কাল এন্ড বোন, নাইট টেম্পলার ইত্যাদি। এরা মূলত দাজ্জালের হয়ে কাজ করার জন্য শয়তানের হাতে বায়আত নিয়েছে। এদেরকে ভবিষ্যতের খবর দেয়ার জন্য যখন জিনেরা আসমানে গিয়ে খবর চুরি করার চেষ্টা করে, তখন ফেরেস্তারা আগুনের গোলা ছুড়ে মারে। যেটাকে আমরা উল্কা বলি।

যেখানে অতিরিক্ত কালো জাদুর চর্চা হয় এবং জীন শয়তানদের আনাগোনা বেশি থাকে, সেখানেই উল্কা পতিত হয়। এজন্যই শুনে থাকবেন যে, কাফেরদের দেশে দুর্গম অঞ্চলে উল্কা (আগুনের গোলা) পতিত হয়। খবর নিলে দেখবেন, ওখানে হয় কালো জাদুর চর্চা হয় আর নয়তো অবাধ্য জিনদের আনাগোনা আছে। বা উভয়টিই হয়।

বর্তমানের কথিত অত্যাধুনিক (আল্ট্রা / স্মার্ট) দুনিয়ায় উল্কা পাতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কেন জানেন? কারণ এখন দুনিয়ায় কালো জাদুকে শিল্পের মান দেয়া হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য কিডস ম্যাজিক নামে সাবজেক্ট রাখা হয়েছে। আবার এটার উপর উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ারও সুযোগ আছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যারা মানুষকে জাদুর কোর্স করায়। এটাকে কেউ খারাপ দৃষ্টিতে দেখেনা বরং সবাই এটার চর্চা করে।

সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান (অপ) ও প্রযুক্তির নামে সবজায়গায় এখন জাদুর চর্চা হয়। ঠিক হ্যারি পটার মুভির মতো।

এমনকি বাংলাদেশেও অনেকগুলো ওয়ান্ডারল্যান্ড (কালো জাদু চর্চা কেন্দ্র) গড়ে উঠেছে। ফলে মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখন প্রায়ই উল্কা পতিত হয়। যা আগে কখনোই হয়নি। হবেই বা না কেন। একদিকে যেমন কালো জাদুর চর্চা হচ্ছে, আরেকদিকে এই সমাজে জিনেরা (ছদ্মবেশে) প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ অবাধ্য জিনদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে। আর এটা এমনি এমনিই হয়ে যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে মুভি, কার্টুন ও নাটকের দ্বারা মানুষকে এটা বুঝানো হয়েছে যে, এলিয়েনরা (জীন) মানুষের বন্ধু।

বরং কিছু কিছু মানুষ তো নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো ইচ্ছা করেই বিকৃত করে জিনদের মতো বানিয়ে নিয়েছে। তাই অনেকসময় কোনটা জিন আর কোনটা মানুষ তা বুঝা যায়না।

বিপর্যস্ত দুনিয়া:

এতক্ষন ধরে আপনাদেরকে দাজ্জালের জান্নাতের (আল্লাহর জাহান্নাম) চিত্র দেখলাম। এবার দেখবেন দাজ্জালের জাহান্নাম (আল্লাহর জান্নাত) এর চিত্র। অর্থাৎ দুনিয়ার আরেকপাশের চেহারা। যেখানে মানুষেরা অত্যন্ত কঠিন ও মানবেতর জীবন যাপন করছে।

সব কিছুরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে। একদিকে যখন সকল সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে, তখন অপরদিকে বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। দাজ্জাল তার বান্দাদেরকে যেসব জান্নাতি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, সেগুলো তো অন্যপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েই দিচ্ছে। সে পৃথিবীর বেশিরভাগ ধন সম্পদ ও খাবার দখল করে রেখেছে। সে, শুধুমাত্র তার পছন্দের অঞ্চলেই সকল নাজ নেয়ামত (দাজ্জালি) পাঠায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার অপছন্দের অঞ্চল গুলোতে অভাব দেখা দেয়। সেখানে মানুষেরা ঠিকমতো, পানি, খাবার, চিকিৎসা কিছুই পায়না। আবার জায়গায় জায়গায় যুদ্ধ এবং দাজ্জালি সিটি গুলো থেকে নিঃসরিত গ্যাসের কারণে অক্সিজেনও অনেক সময় ঠিক মতো পাওয়া যায়না। কেউ কেউ এতো কষ্ট সহ্য করতে না পেরে দাজ্জালি সিটিতে প্রবেশ করতে গিয়ে গুলি বা বর্ডারের তারে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা যায়। কারণ সেই শহরগুলো হাই সিকিউরড। চারদিকে দাজ্জালি আর্মিরা পাহারা দেয়।

যারা দাজ্জালের খুব পছন্দের বান্দা, অর্থাৎ এলিট সম্প্রদায়। তাদেরকে দাজ্জাল তার জান্নাতুল আসগার্ডিয়ায় থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটা এতো বেশি অত্যাধুনিক একটি স্পেস সিটি যে, মানুষ সেখানে না ঢুকলে কল্পনাও করতে পারবেনা যে, এটা কি জিনিস। আল্লাহর জান্নাতে মানুষ যা যা পাবে, দাজ্জালও ঠিক সেরকম করেই সাজিয়েছে এই ভাসমান শহরকে। আর এখানে যত ময়লা আবর্জনা আছে, সবকিছু ফেলা হয় নিচে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বসবাসের স্থানে।

ফলে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিসহ। এই বিষয়টার একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিলো, "এলিটা" নামক একটি এনিমেটেড মুভির মধ্যে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা দেখে অনেক গুলো মুভির কথা মনে পড়ে যায়। যেগুলোতে এরকম পৃথিবীর ধারণা দেয়া হয়েছিল। এখন যেটা বুঝা যাচ্ছে, আসলে তারা এই পৃথিবীকে কিভাবে সাজাবে সেটাই এসব মুভির দ্বারা সাবলিমিনালি প্রচার করতো। আর ভবিষতে যে এমন হবে এটা নিশ্চই তাদেরকে জিনেরা জানিয়ে দিতো, সত্য মিথ্যা মিলিয়ে। যেহেতু একটা সময় (দ্বীনের উপর আসার আগে) খুব মুভি দেখতাম, তাই সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। সবকিছু মিলে যাচ্ছে।

অবশ্য এগুলো সবই যে জিনদের থেকে নেয় তাও নয়। কিছু কিছু কুরআন, হাদিস ও ইসলামী গবেষণা থেকেও নেয়। তবে তা লুকিয়ে লুকিয়ে। এসব থেকে তথ্য নিয়ে তারা নিজেদের মতো করে প্রচার করতো। আর আমিও বিষয়গুলো বুঝতাম। কারণ তাদের অধিকাংশ প্রেডিকশন ইসলামী ভবিষ্যৎবাণীর সাথে মিলে যেত। আর এমন একটা সময় যে আসবে, সেটাও তো হাদিসে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া আছে।

তো বর্তমানে, দাজ্জালের দুটি জান্নাত আছে। একটি ভাসমান (আসগার্ডিয়া)। যেটার একদম উপর লেবেলে দাজ্জাল নিজেই থাকে।

আরেকটা হচ্ছে জমিনে (আল্ট্রা স্মার্ট সিটি)।

আস গার্ডিয়া এটার বরাবর উপরে। ঠিক যেন আরশের মতো। অর্থাৎ জমিনের জান্নাতীদের মাথার উপরে দাজ্জালের আরশ। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট কিছু স্মার্ট সিটি আছে। সেখানেও দাজ্জালের বান্দাদেরকে জান্নাতি সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়।

আবার দাজ্জালের জাহান্নামও দুটি। একটি তো পুরো পৃথিবীই।

আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক ফায়ার (ভয়ংকর এক অন্ধকার কারাগার)। এখানে দাজ্জালের অবাধ্য মুমিনদেরকে জাহান্নামী আজাব (অত্যাচার) দেয়া হয়।

প্রতি সপ্তাহে দাজ্জালের আর্মি পুরো পৃথিবীতে টহল দেয় আর দাজ্জালের গুণগান করে। কাউকে যদি মনে হয়, সে দাজ্জালের অবাধ্যতায় লিপ্ত, তাহলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার প্রতি ৩ মাস পর পর দাজ্জাল নিজে তার গাধায় (UFO) চড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়। সাথে থাকে বিশাল আর্মি বাহিনী। মানুষের মাঝে নিজের বড়ত্ব (খোদাই) প্রচার করে এবং সিজদা দিতে আহব্বান করে। সবাই তার UFO দেখলেই তো মাথা নত করে ফেলে। তবুও সে আলাদা করে সবার সিজদা চায়। কেউ যদি একটু দেরি করে তাকে সাথে সাথে হত্যা করে ফেলা হয়। আর কাউকে যদি বিরোধিতা করতে দেখা যায়, তাহলে তাকে সেখানেই কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। এবং পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।

দাজ্জাল যখন আসে, তখন জনগণকে কিছু প্যাকেটজাত খাবার, পানি, অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ঔষধ দিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে একটু বৃষ্টি নামিয়ে দেয়, পশুর ওলান গুলো দুধে ভরে দেয়। মাঝে মাঝে কারো কারো মৃত বাবা মাকে জীবিত করে দেয় (এগুলো সবই কালো জাদু, প্রযুক্তি ও জিনের সাহায্যে করে)।

এতে জনগণ খুব খুশি হয়, আর দাজ্জালের অনুগত থাকে। অথচ দাজ্জাল তার জান্নাতে প্রাকৃতিক খাবার, পানি ও অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে রেখেছে। আর বাকি মানুষদের জন্য পুরো পৃথিবীকে মিনি জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে। এখানে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের সাথে নিজেদের লড়াই করতে হয়। একজনের সম্পদ আরেকজনকে ছিনিয়ে নিতে হয়। সাধারণ মানুষের অবস্থা এমনি। মুমিনরা বেশিরভাগই দূরে সরে গেছে। অনেকে প্রতিবাদ করে দাজ্জালের জাহান্নামে (আল্লাহর জান্নাতে) চলে গেছে।

বাকি মুমিনরা ভয়াবহ কষ্টের জীবন যাপন করছে। কেউ কেউ সহ্য করতে না পেরে দাজ্জালের কাছে হাত পাতছে।

পানি নেই, খাবার নেই, বিশুদ্ধ বাতাস নেই, ঔষধ নেই, গাছ নেই, চারদিকে রোগ জীবাণু ছড়িয়ে গেছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষগুলো হিংস্র হয়ে উঠেছে। কি ভয়ংকর এক সমাজ??

এমন এক সমাজে আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো?? আর তো পারছিনা। দাজ্জালের বাহিনী যখন আসে, তখন আমরা মাটির নিচে একটি গোপন গর্তে লুকিয়ে পড়ি। বেশিরভাগ দিনগুলো অভুক্ত অবস্থায় জিকির করেই কাটে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন??

ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম: (হত্যা ও বিজয়)

বিভিন্ন জায়গায় দাজ্জালের বাহিনীর সাথে জুন্দুল্লাহদের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধগুলো মূলত মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক চলছে। তবে তার প্রভাব সারা বিশ্বেই পড়েছে।

এখন পৃথিবী দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা দাজ্জালি ব্লক। আরেকটা মাহদী ব্লক।

দাজ্জালি ব্লকে আছে সকল কাফেররা এবং মডারেটরা।

আর মাহদী ব্লকে আছে মুত্তাকী মুমিনরা।

ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে অনেক আগে থেকেই কুফরের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। তিনি কয়েকটি ভূমিতে শরীয়ত কায়েম করেছেন। আমাদের দেশ থেকেও কিছু মুমিন অনেক আগেই সেখানে হিজরত করে চলে গিয়েছিলো। তারা সেখানে ভালোই ছিল। কিন্তু দাজ্জাল তো আর তাদেরকে ভালো থাকতে দিবেনা। তাই সে নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সে নিজেই নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই ভূমিগুলো ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। সেখানে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। কৃত্তিমভাবে খরা ও দুর্ভিক্ষ তৈরী করে দিচ্ছে। এখন সরাসরি যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে। দাজ্জাল তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে জুন্দুল্লাহদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। মুমিনের সংখ্যা কম হওয়ায় ইমাম মাহদী দাজ্জালের সাথে পেরে উঠছিলেন না।

আবার মুমিনদের পরিবারের উপরেও চালানো হচ্ছে নির্যাতনের স্টিম রোলার। মুমিন শিশু ও নারীদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

এমন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উপর রহমত নাজিল করলেন। তিনি দুনিয়ার বুকে ঈসা (আ:) কে পাঠালেন। দুই ফেরেস্তার কাঁধে ভর করে তিনি সিরিয়ার দামস্কে সাদা মিনার মসজিদে অবতরণ করলেন। এ খবর পৌঁছে গেলো, সারা দুনিয়ায়। মুমিনরা তো খুশিতে আত্মহারা। কিন্তু দাজ্জাল ভয়ে পাগলপারা। তবে দাজ্জালি মিডিয়া ঈসা (আ:) কে ভিন গ্রহের ভয়ংকর এলিয়েন বলে প্রচার করায়, অধিকাংশ মানুষ আবারো ধোঁকা খেলো। যেমনটা খেয়েছিলো ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সময়। উনাকে সন্ত্রাসী বলে সকল মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ তাই মনে করেছিল। এবং তার সঙ্গে ত্যাগ করেছিল।

কিন্তু এবার আর কোনো কৌশল যে কাজে লাগবেনা, এটা দাজ্জাল ভালো করেই জানে। দাজ্জাল এটাও জানে যে ঈসা (আ:) আল্লাহর নবী। এবং তিনি তাকেই হত্যা করতে এসেছেন। ফলে সে পালানোর চিন্তায় পেরেশান হয়ে গেলো। দাজ্জাল ঈসা (আ:) এর ভয়ে ইজরায়েলে গিয়ে লুকালো। কারণ তার ভাসমান জান্নাতটি (আসগার্ডিয়া) ঈসা (আ:) এর সাথে থাকা ফেরেস্তারা অবতরণের সময়েই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তাই সে এখন তেল আবিবের একটি বাংকারে এসে লুকিয়েছে।

তার বাহিনী (বান্দারা) তাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। প্রভুর পালানোর জন্য লুদ এয়ারপোর্টে একটি উন্নত বিমান দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বিমান? হা বিমান। কারণ UFO গুলোও ইতিমধ্যে জুন্দুল্লাহ এবং ফেরেস্তারা সম্মিলিত ভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে। দাজ্জালের জন্য এতদিন যেমন জিনেরা কাজ করেছে, এখন মুমিনদের জন্য ফেরেস্তারা কাজ করছে। আর ঈসা (আ:) এবং ফেরেস্তাদের আগমনের কথা শুনে জিন শয়তানেরাও অনেক আগেই পালিয়েছে।

দাজ্জাল তো জানতোই, ভবিষ্যতে তাকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তাই সে আগে থেকেই সেখানে নিরাপদ একটি বিমান ঘাঁটি বানিয়ে রেখেছিলো। দাজ্জাল এবার রওয়ানা দিয়েছে বিমানে উঠে পালানোর জন্য। কিন্তু ঈসা (আ:) এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে গেলো। তিনিও দাজ্জালকে ধরার জন্য জুন্দুল্লাহদের একটি বাহিনী নিয়ে বাবে লুদের দিকে রওয়ানা দিলেন। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় লুদ এয়ারপোর্টের মূল ফটকে দাজ্জালকে ধরে ফেললেন। আর সাথে সাথেই উনার তলোয়ারটি দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করে ফেললেন। রক্ত মাখা তলোয়ারটি সবাইকে উঁচু করে দেখালেন। উপস্থিত সবাই আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। এবং তাকবীর দিয়ে পুরো এয়ারপোর্টকে কাঁপিয়ে দিলেন।

দাজ্জাল ছিল মুমিনদের জন্য চরম এক পরীক্ষা আর ইহুদিদের জন্য শাস্তি। ইহুদিরা গোড়ামি করে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স:) কে শেষ নবী হিসেবে মেনে নেয়নি। আবার ঈসা (আ:) কেও হত্যা করতে চেয়েছিলো। তাই আল্লাহ তাদেরকে দাজ্জালের দ্বারা কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। এবং দেখিয়ে দিয়েছেন, তারা ঈসা (আ:) কে হত্যা করতে পারেনি। আর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদই (স:) শেষ নবী ছিলেন।

ইহুদিরা মনে করেছিল দাজ্জালই তাদের সেই কাঙ্খিত শেষ নবী বা মেসিয়াহ। কিন্তু তারা যখন দেখলো তাদের মেসিয়াহ মারা গেছে, এবার তারা পলায়ন শুরু করলো। যে যেখানে পারলো লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু প্রকৃতি অবাধ্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো। পাথর ও গাছেরা মুমিনদেরকে ডেকে ডেকে বলছে: " হে মুমিন, আমার পিছনে একটা ইহুদি লুকিয়ে আছে, এসো তাকে হত্যা করো"। মুমিনরা সব ইহুদীদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু গারকাদ গাছ কোনো আওয়াজ দিচ্ছেনা। কারণ সেটা ইহুদিদের গাছ। তবুও জুন্দুল্লাহরা সেখানে গিয়ে ওদেরকে খুঁজে বের করছে। আর হত্যা করছে।

পৃথিবীর সকল অবাধ্য ইহুদি এখন ইজরায়েলে আছে। তাই মুমিনদের জন্য খুব সহজ হচ্ছে, তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিতে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সব ইহুদিদের হত্যা করে ফেলা হলো।

অনেক অনেক চেষ্টা ও কুরবানীর পর মুসলিমদের প্রিয় ভূমি ফিলিস্তিন, নাপাক ইহুদিদের বিচরণ থেকে পবিত্র হলো, আলহামদুলিল্লাহ।

তুর পাহাড়ের পথে:

দাজ্জালি বাহিনী নিজেদের স্মার্ট সিটি গুলো ছাড়া পুরো পৃথিবীকেই একটা জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছিলো। ওখান থেকে যত ময়লা, আবর্জনা, গ্যাস, বিষাক্ত কেমিকেল, ইত্যাদি সবকিছু সাধারণ মানুষের বসবাসের স্থানে ফেলে দিতো। তার উপর বিভিন্ন রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার ও অন্যান্য ডিভাইসের রেডিয়েশনে পৃথিবীর চেহারা একদম পাল্টে গিয়েছে। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাও হারিয়ে গেছে। কেউ কোনো কিছু চাষ বা লালন করবে? সেই সুযোগও নেই। এখন চারদিকে আরো বেশি হাহাকার শুরু হয়েছে। কারণ এতো দিন যেসব প্যাকেট জাত খাবার আসতো এখন তাও বন্ধ। অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মানুষ যে যার উপর যেভাবে পারছে হামলা করে তার শেষ সম্বল টুকুও ছিনিয়ে নিচ্ছে।

কোথাও যদি একটু পানি বা খাবারের সন্ধান পাওয়া যায়, সবাই সেখানে হামলা করে। কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে কেউই কিছু পায়না। বরং অনেকে মারামারি করে নিহত হয়। কিছু কিছু জায়গায় মানুষ ক্ষুদার যন্ত্রনায় এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যে, মরা মানুষ খাওয়া শুরু করেছে।

এই খবরটি শুনে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই। কারণ সামনে এরা খাবারে অভাবে জীবিত মানুষকেও মেরে খাওয়া শুরু করবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই, এখান থেকে সরে যেতে হবে। হিজরত করতে হবে। যখন দ্বীনের উপর এসেছিলাম এবং লড়াইয়ের ফজিলত জেনেছিলাম, তখন থেকেই হিজরত ও লড়াইয়ের তীব্র বাসনা মনের মধ্যে ছিল। ছাত্র অবস্থায় কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনো পথপ্রদর্শক না পাওয়ায় যেতে পারিনি। আর বিয়ের পর তো বিভিন্ন ঝামেলার কারণে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই আর হিজরত করতে পারিনি।

কিন্তু আমি তো জানতাম, বেঁচে থাকলে এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে একদিন। আজ সত্যিই সেই ভয়ংকর সময়টা চলে এসেছে।

কিন্তু কোথায় হিজরত করবো? কার সাথে যাবো? কিভাবে যাবো?

সালাতুল হাজত নামাজ পড়ে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি। প্রতিদিন দোআ কান্না কাটি করছি আল্লাহর দরবারে।

কিছুদিন পর কয়েকজন জুন্দুল্লাহ ভাইয়ের সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। তারা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে একটি জামাত তৈরী করে তুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করবেন।

কারণ ঈসা (আ:) সকল মুমিনদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে উঠে যাবেন বলে এলান দিয়েছেন। তাই জুন্দুল্লাহরা মুমিনদের জামাত তৈরী করছেন সেখানে যাওয়ার জন্য।

আমি একজন জুন্দুল্লাহ ভাইয়ের কাছে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন: "দাজ্জাল যেসব স্মার্ট সিটি তৈরী করেছিল সেখানে দাজ্জালের হেড কোয়ার্টার থেকে সব কিছু সাপ্লাই হতো। সেটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সেসব জায়গায় সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছানো বন্ধ হয়ে গেছে। আর এক মাসের মধ্যে তাদের নিজস্য মজুদ ভান্ডারও শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ভাইয়েরা তো শুধু দাজ্জাল, ইহুদি এবং কিছু মুশরিকদের হত্যা করেছে। আর যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যদিও অনেক কাফের মারা গেছে, তবুও এখনো কোটি কোটি কাফের এবং দাজ্জালের অনুসারীরা বেঁচে আছে। আবার অনেক জংলী জাতীও আছে। তারা এখন খাবার ও পানির অভাবে দিন দিন পশু হয়ে উঠছে।

এরা নিজেরাই নিজেদের উপর হামলা করবে। একজন আরেকজনকে মেরে খেয়ে ফেলবে। সামনে যা পাবে তাই খেয়ে ফেলবে। সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে। এদের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হবেনা। তাই আমাদেরকে তুর পাহাড়ে লুকিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

আমি ভাইটির এ কথা শুনে বুঝে ফেললাম, ইয়াজুজ মাজুজ (এদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে রূহ ভাইয়ের ‘‘গগ ম্যাগগ, বন্দি নাকি মুক্ত’’ বইটি পড়া যেতে পারে) বের হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

আমি তাড়াতাড়ি আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে আহলিয়া ও ছেলে মেয়েকে প্রস্তুত হতে বললাম। আমার বড় ছেলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গিয়ে শহীদ (ইনশাআল্লাহ) হয়ে গেছে অনেক আগেই, আলহামদুলিল্লাহ। তাই আমরা এখন ৫ জন। আমি, আহলিয়া, ও ৩ ছেলে মেয়ে। পোর্টেবল বেডিং ও মশারি তো আগে থেকেই ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আর খাবার যা ছিল সব নিয়ে পরের দিন রাতে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলাম। আরো অনেক পরিবার এসেছে।

বড় একটি জামাত তৈরী হয়েছে। এবং জামাতের একজন আমির নির্ধারণ করা হয়েছে। আমিরের নির্দেশে দু দিন পরের রাতে পুরো জামাত পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মিশরের দিকে পায়ে হেটে রওয়ানা দিলাম। হাটতে হাটতে মনে পড়ছে সিরিয়ানদের কথা। অনেক বছর আগে তারাও এভাবে হেটে হেটে সফর করেছিল। চলছি আর দুনিয়ার এক বীভৎস চেহারা দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতি অদ্ভুত রকম রূপ ধারণ করেছে। একেক জায়গায় একেক রকম রূপ তার। কোথাও সব কিছু পুড়ে গেছে, কোথাও বরফে ঢেকে গেছে। কোথাও ভূমি ধসে গেছে। কোথাও উল্কাপাতের কারণে বিশাল বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়ে আছে।

আসলে দাজ্জাল তার জাদু ও প্রযুক্তির দ্বারা পুরো প্রাকৃতিক সিস্টেমটাকেই এলোমেলো করে দিয়েছিলো।

এছাড়াও সূর্যের আলোকে দাজ্জাল এতদিন ব্লক করে রেখেছিলো। তাই পৃথিবীতে ঠিকমতো আলো পৌঁছাচ্ছিলোনা। ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এক বিদঘুটে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। টিকা, রেডিয়েশন ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারে অনেক মানুষ ও জীব জন্তু বিকলাঙ্গ (জোম্বি) হয়ে গেছে।

জায়গায় জাগায় মানুষ মরে পচে আছে। বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন জ্বলছে। আমাদের সম্বল এখন জিকির আর সামান্য কিছু জমিয়ে রাখা পুরানো শুকনো খাবার। আমরা মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সফর করি। কারণ ব্ল্যাক বেরিয়ার (সূর্যের আলো আসতে না দেয়ার পর্দা) এখন অনেকটাই সরে গেছে। ফলে দিনে আলোকিত হয়ে যায়। আর দিনের আলোয় সফর করাটা রিস্ক। আমাদের জামাতের আমির সাহেব সেই রিস্ক নিতে চান না। দিনের বেলায় আমরা নিরাপদ একটি স্থানে তাবু গেড়ে, আমল, তালিম ও জিকিরের মাধ্যমে কাটিয়ে দেই।

এক মাস এভাবে চলতে চলতে আমরা ইরাক ও ইরানের বর্ডারে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের হিসেব অনুযায়ী এখন দাজ্জালি সিটির জমিয়ে রাখা খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এরা এখন খাবারের সন্ধানে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সাথে অন্যরাও থাকবে। কোটি কোটি মানুষরূপী জন্তু। তাই আমাদের হাতে সময় খুব কম। আরো প্রায় ১ সপ্তাহের সফর। এর মধ্যেই আমাদেরকে অবশ্যই তুর পাহাড়ে পৌঁছাতে হবে।

সফরের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন আমির সাহেব। তিনি চাচ্ছেন আগামী ২/ ৩ দিনের মধ্যে পৌঁছাতে। কারণ পৃথিবীতে একটা গুজব ছড়িয়েছে যে, ফিলিস্তিনিতে নাকি খাবার আছে আর তাবাড়িয়া সাগরে পান যোগ্য পানি আছে। তাই সবাই সেদিকে ছুঁটে আসছে। এ খবরে সবাই পেরেশান হয়ে গেলাম এবং আমাদের গতি বাড়িয়ে দিলাম, যদিও আমরা অনেক ক্লান্ত।

এবার দিনের কিছু অংশেও সফরের সিদ্ধান্ত হলো। ফলে আলহামদুলিল্লাহ তিনদিনের মাথায় আমরা মিশরে এসে উপস্থিত হলাম। আর কয়েকঘন্টা পর আমরা তুর পাহাড়ের দেখা পাবো ইনশাআল্লাহ। অবশেষে আমাদের কাঙ্খিত পর্বতের দেখা পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ। সবাই আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। আরো কয়েকটি মুসলিম জামাত বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। অনেকে আগেই পাহাড়ে উঠে গেছে। আরো কিছু জামাত নাকি পথে আছে।

আমরা উপরে উঠার জন্য অপেক্ষা করছি। পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছি।

(পাহাড়টি মিসরের দক্ষিণ সাইনা জেলায় অবস্থিত। সাইনার মূল শহরের নাম 'আত তুর'। বড় শহরের নাম- শারমুশ শাইখ। পাহাড়টির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৮৫ মিটার। এই পাহাড়কে জাবালে মূসা নামে নামকরণ করা হয়েছে। সাইনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জেলা এবং এই এলাকার নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখ হয়েছে। এই পাহাড়ি এলাকায় এক প্রকার গাছ হয় যা থেকে তেল তৈরি হয়। সাইনা নবীদের বরকতময় ভূমি। এই এলাকায় অনেক নবী রাসূলের আগমন ঘটেছে। এখানেই রয়েছে সেই ঐতিহাসিক ‘জাবালে মূসা’’, অনেক নবীদের কবর, বনী ইসরাঈলের ‘তীহ’ নামক ময়দান। আরো অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে এই মাটি ও পাহাড় সম্পৃক্ত।)

আলহামদুলিল্লাহ, আজ এই পাহাড়ে নিচে বসে আছি। একটু পর উপরে উঠবো ইনশাআল্লাহ। অবশেষে সেই সুযোগটাও চলে এলো। আমাদের জামাত পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় পেলো। পুরো পাহাড়ে বিভিন্ন দেশের মুমিনদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। বাকি এক সপ্তাহের মধ্যে অন্যরাও চলে এসেছে, মাশাআল্লাহ। আর যারা আসতে পারেনি তারা নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদেরকে গৃহবন্দী করে নিয়েছে। আসলে ১ % মুমিন ছাড়া বাকি সবাই এখন মানুষরূপী অদ্ভুত এক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মানবতা কিচ্ছু নেই। আছে শুধু হিংস্রতা আর বর্বরতা।

এদের একটি বিশাল দল তাবাড়িয়া সাগরের কাছে এসে দেখে সেখানে কোনো পানি নেই। থাকবেই বা কিভাবে? এদেরই প্রথম দল যে সেই পানি শেষ করে ফেলেছে, এটা তারা ভুলেই গেছে। ওখানে পানি না পেয়ে তারা আরো হিংস্র হয়ে উঠলো। চারদিকে ধ্বংস লীলা শুরু করেছে। এদিকে আমরা সহ সকল স্থানে সকল মুমিনরা দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকায় অস্থির হয়ে উঠলো। এতদিন খানা পানি ছাড়া শুধুই জিকির দিয়ে পার করেছে সবাই। এখন আর পারছেনা। তাই ঈসা (আ:) সহ সকল মুমিন আল্লাহর দরবারে দোআ করা শুরু করলেন। কিছুদিন দোয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার বুকে একটি জীবাণু ছেড়ে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এই জীবাণু সকল অবাধ্যদেরকে মেরে ফেললো। পুরো পৃথিবী জুড়ে এদের লাশ পরে আছে। এবার দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা।

এদের লাশের ঘন্ধে পুরো পৃথিবী দুর্ঘন্ধময় ও দূষিত হয়ে গেছে। ফলে বের হওয়া যাচ্ছেনা। তাই মুমিনরা আবার দোআ করায় আল্লাহ তায়ালা এদের লাশকে বড় বড় পাখির দ্বারা দূরে নিয়ে ফেলে দিলেন এবং ভারী বৃষ্টি দিয়ে পুরো পৃথিবীকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন। ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরিবেশ ঠিক হয়ে গেলো। একদম প্রাকৃতিক। একদম পরিচ্ছন্ন। একদম বিশুদ্ধ। একদম·····

==========

আব্বু, আব্বু! এই আব্বু! আব্বুউউউউ!

চোখ মেলে দেখি আমার ছেলে আমাকে ডাকছে!

গোসল করে এশার নামাজ পড়ে নিজের বিছানায় বসে একটা কিতাব দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়ালই নেই! তার মানে এতক্ষন আমি স্বপ্ন দেখছিলাম??

স্মার্ট পৃথিবী, আলট্রা স্মার্ট সিটি, আধুনিক সংস্কৃতির নামে কালো জাদুর চর্চা:

বিপর্যস্ত দুনিয়া:

ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম: (হত্যা ও বিজয়)

তুর পাহাড়ের পথে:

এগুলো সবই স্বপ্ন ছিল?? অথচ কত বাস্তব মনে হয়েছে! কি আশ্চর্য ব্যাপার?? সবকিছু যেন বাস্তবে অনুভব করছিলাম! আজব কান্ড!

তবে এগুলো স্বপ্ন হলেও সামনের ভবিষ্যতে তো এমনি হতে যাচ্ছে! হুবহু না হলেও অনেক কিছুই এমনটাই হবে বলে মনে হচ্ছে! বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন!

সমাপ্ত